ভারতকন্যা নিবেদিতা

ভারতকন্যা নিবেদিতা

মীরা ঘোষ

এভারেস্ট বুক হাউস

বি ঘোষ কর্তৃক এভারেষ্ট বুক হাউস এ বারো এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলকাতা বারো হইতে প্রকাশিত ও লক্ষ্মীশ্রী প্রেস পনেরোর এক ঈশ্বর মিল লেন কলকাতা নয় হইতে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ রূপ দিয়েছেন শিল্পী শ্রীনীতিশ মুখার্জী।

মূল্য ২·০০

ভারতকন্যা নিবেদিতা
মীরা ঘোষ
মূল্য ২·০০

কল্যাণীয়াসু

মঞ্জুশ্রীকে

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ছোট্ট শহর ডানগানন। [illegible] শহরের ছোঁয়া তখনো এসে লাগেনি। কল কারখানার চিমনীর ধোঁয়া, গাড়ী ঘোড়ার ভীড়, লোকের ব্যস্ততা—এসব তখনো শুরু হয়নি। সেখানকার লোকেরা সুখে শান্তিতে সরল জীবন কাটিয়ে দিত।

এই শহরেই ছোট্ট একটা সোনার সংসার ছিল। ভগিনী নিবেদিতার বাবা আর মায়ের। স্যামুয়েল আর মেরী নোবলের।

স্যামুয়েলের ছিল কাপড়ের কারবার। ব্যবসা দেখতে গিয়ে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হোত। পরিশ্রম করতে কোনদিনও পেছপা ছিলেন না স্যামুয়েল নোবল। খালি রোজগার করে আর সংসার করে গতানুগতিক জীবনের একঘেয়েমি তাঁর ভাল লাগতো না। সুখে শান্তিতে মুখটি বুজে জীবন কাটিয়ে যাওয়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। অথচ বাইরে থেকে দেখলে স্যামুয়েলের চরিত্র বোঝাই যেতনা।

আয়ার্ল্যাণ্ডে তখন স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন চলেছে। দেশের শাসন স্বদেশের লোকেরাই করবে। শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষেরা সকলেই এই আন্দোলন মনে প্রাণে আপন করে নিয়েছে। স্যামুয়েলের ইচ্ছেও ছিল দেশের মুক্তি আন্দোলনে তিনি কাজ করবেন। সুখের জীবন, সুখের সংসার, এই আয়েস আর স্বাচ্ছন্দ্য মোটেই ভাল লাগতো না। কিন্তু মায়ের মুখ চেয়ে আর মেরীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে স্যামুয়েল কাজ করে যেতে লাগলেন। যতদিন দোকান চালিয়েছেন—'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—'—এই বাক্যের হেরফের কখনো হয়নি।

দিয়েছিল। ঠাকুরমার স্নেহ এবং ব্যক্তিত্ব মার্গারেট কোনদিন ভুলতে পারেনি। বড় হয়ে দেখা গেল ঠাকুরমার চরিত্রের অনেকখানি মার্গারেটের মধ্যে মিশিয়ে আছে। সেই রকম ব্যক্তিত্বময়ী, নিষ্ঠাবতী আর স্নেহময়ী। ঠাকুরমার এই সব গুণগুলো ছোট্ট ডানগানন শহরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু নিবেদিতা অনেক বড় হয়ে যখন মানব প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন এই সব গুণগুলো তখন কোনো গণ্ডীর বাধা মানলো না। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। মানবের কল্যাণের উদ্দেশে দেবতার পায়ে তিনি নিবেদিত। সকলের তিনি ভগিনী নিবেদিতা। হলেন লোকমাতা নিবেদিতা।

ঠাকুরমার কাছেই তার জীবনের প্রথম দীক্ষা। লেখা পড়ায় হাতেখড়ি আর ধর্মের সঙ্গেও পরিচয়। সেই কবে জন্মের সময় ওকে ক্যাথলিক গীর্জায় দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যাকে 'ব্যাপ্টাইজ' করা বলে, সে সময়ে মার্গারেটের অজ্ঞান অবস্থা। যখন কিছু কিছু বুঝতে শিখলো, জানতে শিখলো তখন নতুন করে পরিচয় হোল ধর্মের সঙ্গে। পরিচয় হোল ঠাকুরমার সহায়তায়। লেখাপড়া শুরু হয়েছিল রংচঙে ছবিওয়ালা বাইবেল দিয়ে। ঠাকুরমার আবার ছিল মিষ্টি গানের গলা। তাঁর গলায় গলা মিলিয়ে খৃষ্টের ভজন গাইতে শিখলো। তখন মার্গারেট চার বছরের ছোট্ট, মেয়েটি।

এমন সময়ে ওর বাবা মা এলেন মার্গারেটকে নিয়ে যেতে। বাবা তখন ওল্ডহ্যাম চার্চে ধর্মযাজকের পদ পেয়েছেন। বাবা এলেন, মা এলেন, আর এলো ওর ছোট্ট তিন বছরের বোন, মে। মাকে যেন মনে হোল এই প্রথম দেখলো। তবু কীসের যেন টান সে অনুভব করে। আর করে ঈর্ষা। মনে হোল, মা ওকে ভালবাসলেও বোনটিকে আদর করেন বেশী। সকলে মিলে ওল্ডহ্যামের বাড়ীতে চলে এল। ঠাকুরমা রইলেন ডানগানন শহরে ......

আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে ইংলণ্ডে এসে শুরু হল নতুন জীবন। কোথায় ডানগানন আর কোথায় ওল্ডহ্যাম। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ। সেখানে ছিলেন ঠাকুরমা একাই সব। এখানে বাবা, মা, বোন, আরো কিছু অপরিচিত অনাত্মীয় লোকজন। তবু সকলের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হল না। একজন অন্তরংগ সঙ্গীও জুটে গেল। সে হল বাড়ীর ফাই ফরমাজ খাটা মাইনে করা লোক। মার্গারেটকে নানান গল্প শোনাত। ভারী মজা লাগতো। তার মনের কল্পনাও ঘর সংসারের পরিবেশ পেরিয়ে ছুটে যেত কোথায় চলে·····কোন তেপান্তরের রাজ্যে·····। মার্গারেটের স্বাধীন মনের বিকাশ এই ভাবেই হয়েছে। কোথাও বাধা পায়নি। ঠাকুরমার কাছে গান গাইত, গল্প শুনতো, বাগানের ফুল কুড়াতো। এখানে এসেও নতুন লোক পেল গল্প বলার। তিন বছরের বোনকেও খেলার সঙ্গী করে নিল।

কিছু দিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে আর খারাপ লাগতো না ওর। বোনের সঙ্গে খেলা। এক সঙ্গে স্কুলে যাওয়া। এক বিছানায় শোয়া। কেউ কারুর কাছ ছাড়া হতে পারে না।

কিন্তু একটা জিনিশ ওর ভালো লাগতো না। ওল্ডহ্যাম শহরের চারিদিকের পরিবেশ। ডানগানন ছিল গ্রাম্য শহর। সেখানে অনেক গাছপালা। ছিল বাড়ীর বাগান। বাগানে ফুল, প্রজাপতি, ঝোপ ঝাড়। এখানে সে সব কিছু নেই। রুক্ষ শহর। অন্ধকার সরু সরু পথ। বাড়ীগুলো ঘেঁসাঘেঁসি। স্কুলে কড়া শাসন। খেলার সময় কম, খেলার সময়ে বাইবেল মুখস্থ করতে হোত। তাই ভাল লাগতো না এই ওল্ডহ্যাম সহরের জীবন। বিকেলে যখন স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে আসতো তখনই ছিল দিনের মধ্যে সেরা সময়। আরো অনেক

ছেলে মেয়ে জুটে যেত। সবাই মিলে ছুটোছুটি করে খেলা হোত।

তবু কয়েক বছর এই শহরেই কেটে গেল।

• বয়স যখন সাত তখন একদিন খবর এল ঠাকুরমার শেষ সময়। কেবল ওর বাবা গেলেন ঠাকুরমাকে দেখতে। বাবা ফিরে এলেন মৃত্যুর খবর নিয়ে। মার্গারেটের অতিপ্রিয় ঠাকুরমা হারিয়ে গেলেন কোন দূর কল্পলোকে……। এর পরে আর কিছুদিন ওরা ওল্ডহ্যামে ছিল।

এই ওল্ডহ্যাম শহর ছেড়ে একদিন চলে যেতে হল। কেননা এখানে অতিরিক্ত খাটুনি স্যামুয়েলের সহ্য হোল না। ক্রমেই শরীর ভেঙে পড়তে লাগলো। স্যামুয়েল কখনো পরিশ্রমে পেছপা ছিলেন না। গীর্জার কাজ, লেখাপড়া করেও স্বদেশের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন। দেশের মঙ্গল চিন্তা ছাড়াও স্বদেশের লোকজনদের সেবার কাজও করতেন। সারাদিন খাটুনির পর এতো ধকল সইতো না। তাই অল্প পরিশ্রমের আশায় শহর ছেড়ে গাঁয়ের কর্মস্থল বেছে নিতে হল। আরো ফাঁকা মুক্ত জায়গা চাই। আরো অবসর চাই। স্বাস্থ্য আরো ভাল রাখতে হবে। কেননা স্বদেশের মুক্তি এখনও আসেনি। দেশ জননীর আহবান ছেড়ে কোন মায়ালোকে তিনি যাবেন? তাছাড়াও ছোট মেয়ে মার্গারেট, মে। এদেরও বড় করে তুলতে হবে।

ডেভনশয়ারে' গ্রেট টরেন্টন গ্রামে স্যামুয়েল চলে এলেন শহরের বাস উঠিয়ে নিয়ে। মার্গারেট ফিরে পেল গাছপালা, বাগান, পাখীর ডাক। রং বেরঙের' ফুল। দিগন্ত জোড়া মাঠ। সোঁদা মাটির গন্ধ। এখানে আকাশ যেন আরো বড়। আরো ঘন নীল। রোদ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দশদিক। স্যামুয়েলের স্বাস্থ্যও যেমন কিছুটা ভালো হোল তেমনি মার্গারেটও দেহে মনে বড় হয়ে উঠতে লাগলো। অনেক নতুন অভিজ্ঞতার

শুরু হল। এখন মার্গারেট বড় হয়েছে সাত বছর পেরিয়ে আট বছরে পড়েছে। এখন তাকে অনেক জানতে হবে, শুনতে হবে। আশে পাশে অনেকের সঙ্গে পরিচয় শুরু হল। শুরু হল মায়ের হাত ধরে গীর্জায় যাওয়া।

গীর্জায় গম্ভীর ধর্মসঙ্গীত আর পুণ্যাত্মা পিতৃদেবের ভাষণ আট বছরের শিশুর মনে গভীর ছাপ রেখে যায়। মনের আর স্বভাবের পবিত্র দিক আস্তে আস্তে বিকশিত হয়ে ওঠে। মায়ের সঙ্গে প্রার্থনায় বসে। যিশুর ভজনা করে। মুগ্ধ আগ্রহে বাইবেলের গল্প শোনে। মায়ের কাছটিতে বসে গল্প শোনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা কোন দিন ভোলার নয়। মনে হয় যেন অতীতের নায়ক নায়িকারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ডেভিড, সলোমন, মাতা মেরী সবাই বাইবেল থেকে চোখের সামনে এসে হাজির হোত। এরা সবাই তার কল্পলোকের সঙ্গী।

কিন্তু কল্পলোক ত্যাগ করে এই জগতের ভাবনাও তার সুরু হয়েছে। কেননা মার্গারেট এখন দশ বছরের মেয়ে। তাকে বাবার কথাও ভাবতে হয়, মায়ের কথাও। ভাই বোনদের ভাবনাও তার আসে। পরপর তার তিনটি ভাই এই টরেন্টন গ্রামে মারা গেল। বাবা মায়ের ব্যথা নিবিড় হয়ে মার্গারেটের মনে ছাপ ফেলে যায়। এই কষ্টের সংসারে বাবাকে তার কেমন অসহায় মনে হোত। এমনই স্বাভাবিক। ছোট বয়সে অনেকের তা মনে হয়। বিশেষ করে মার্গারেটের স্পর্শ কাতর মন।

বাবা থাকতেন লেখাপড়া আর গীর্জার কাজ নিয়ে। দৈনন্দিন কাজে ডুবে থাকতেন তিনি আত্মমগ্ন হয়ে। কাজের সময়ে বাইরের পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করতো না। ঠিক এই সময়টিতেই মার্গারেট চুপটি করে এসে বসতো পাশে। তার চুলোয় যেত খেলাধুলো, বেড়াতে যাওয়া। বাপের সব সময়ের সঙ্গী হয়ে গেল ও। স্যামুয়েল উপাসনা করেন পাশে বসে থাকে

মার্গারেট। মণ্ডলীতে ভাষণ দিচ্ছেন, মেয়েকে সঙ্গে রাখতে হয়েছে। বাবার সব কিছুই সে লক্ষ্য রাখে। তাঁর বলার কায়দা, মাথা নাড়ার ভঙ্গী। জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন কর্মী ও নেতার আসনে রয়েছেন স্যামুয়েল। সহজাত হয়ে গেছে তাঁর নেতৃত্বের ভাব। ভারিক্কী আদব কায়দা। শিশু মার্গারেট বাবার দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতে এসব ও আয়ত্ত করে ফেললো। অচেতন শিশু মনে সেই ছাপ পড়বেই—প্রতিদিন সজ্ঞানে যে আচার আচরণ তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে, আবিষ্ট করেছে তার প্রভাব থেকে মার্গারেটের মুক্তি নেই। একদিন জগতের জন সমক্ষে মার্গারেটকে কর্ত্রীত্বের আসনে এসে বসতে হবে। তার প্রাথমিক পাঠ শুরু হল বাপের আদব কায়দা থেকেই।

তার এই স্বভাব স্কুলে প্রকাশ পেত বন্ধুদের উপর। ভাই বোনদের মধ্যে সে সকলের বড়' এখানেও সে কর্ত্রী। মনে হত ঐটুকুন ছোট মেয়ের এটা অহংকারের ভাব। আসলে এতে তার স্বভাবের বিকাশ ঘটছে। একদিন সকলে যাকে জানবে, শুনবে, শিশু জীবন থেকে এরকম ভাব তার মধ্যে দেখা দেবেই। মনে মনে এমন অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প মার্গারেট বানাতো যে সব গল্পের সে নিজেই নায়িকা। এ সব গল্প সে তার বন্ধুদের বলতো। নিজেকে বড় করে দেখার ইচ্ছে মার্গারেটের কথায় বার্তায় ভাবনা চিন্তায় উঁকি ঝুঁকি মারতো।

একদিন ঘটে ছিল এক আশ্চর্য ঘটনা। স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এক ধর্ম যাজক। অনেক দিন তিনি ভারতবর্ষে কাটিয়েছেন। বাবাকে মার্গারেট কাছ ছাড়া করে না। সেদিনও ছিল সে বাবার পাশে। ভারতবর্ষের গল্প করতে করতে সেই ভদ্রলোকের চোখে পড়লো মার্গারেটের মুখ। মার্গারেটের আত্মমগ্ন ভাব দেখে তিনি কেন জানি তাকে বলে উঠলেন: 'ভারতবর্ষ একদিন আমাকে ডাক দিয়েছিল—হয়তো তোমাকেও

একদিন ডেকে নিতে পারে।' বিচিত্র এই ঘটনা! সেদিন এটা কোন ভবিতব্য বলে মনে হয়নি। না হওয়াই তো স্বাভাবিক। তবু আশ্চর্য কৌতূহলে মার্গারেট উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। ভারতবর্ষ অজানা দেশ। ভারতবর্ষের নাম সে শোনে নি! দূর বিদেশে যাবার আকাঙ্ক্ষা মনে দানা বাঁধলো কিনা বোঝা যায়নি কিন্তু বাবাকে তার কৌতুহল মেটাতে হোল। স্যামুয়েল পৃথিবীর মানচিত্র খুলে ধরলেন। কৌতূহলী মার্গারেট কেবল রেখায় আর রঙে ভারতবর্ষকে চিনে রাখলো।

এর পরেই এল সেই দুর্দিন, পীড়িত স্যামুয়েলকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল। মেয়ে তাকে কাছ ছাড়া করতে না চাইলেও মহাকালের আহ্বান কেই বা এড়িয়ে যেতে পারে? মার্গারেটকে সঠিক চিনেছিলেন স্যামুয়েল। তাঁর দিনের দীর্ঘ সময়ের সঙ্গী এই মেয়েটি। দশ বছরের কিশোরী। কিন্তু কাজে আর আচরণে দশ বছরের কিশোরীর মত মনে হয় না। অন্য সকলের থেকে আলাদা। আলাদা তার স্বভাব আর ধর্ম। পিতা ঠিক চিনেছিলেন। তাই মৃত্যুশয্যায় স্ত্রী মেরীকে ডেকে বলে গেলেন—'...মার্গারেটকে কোনদিন বাধা দিও না। জানি ও অনেক বড় হবে। বড় হওয়ার জন্যই ও এসেছে।' পিতার মুখে সেদিন আশীর্বাদের মত এই কথাগুলো চমক দিয়ে গেল। মৃত্যুপথ যাত্রী এই ধর্মপ্রাণ স্বদেশ হিতৈষী মনীষীর আকাঙ্ক্ষা আমরা ভারতবর্ষের মানুষে চিরদিন স্মরণে রাখবো। কেননা, তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা আমরা সত্যি হতে দেখেছি।

মার্গারেট এবার নতুন জগতে প্রবেশ করলো।

ওদের অভিভাবক হলেন দাদু হ্যামিল্টন। হ্যামিল্টন ওদের মাতামহ। এখন দুই বোন বড় হয়েছে। হ্যালিফ্যাক্সএর বোর্ডিং স্কুলে ওদের ভর্তি করে দেওয়া হোল। ওদের আর এক ছোট

ভাই রয়েছে। নাম রিচমণ্ড। রিচমণ্ড তখন খুব ছোট। শুধু খেলেই বেড়াত।

হ্যালিফ্যাক্সেএর বোর্ডিং স্কুলে কড়া শাসন আর নিয়মের রাজত্ব। মার্গারেট নিজেকে তৈরী করে নিয়েছে। বয়সের তুলনায় সে এখন অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। বুঝতে পারে জীবনে নিয়ম মেনে চলতেই আনন্দ। তার বাবাকে দেখেছে। তার ঠাকুরমাকে দেখেছে, সবাই ছিলেন নিয়মের অধীন। শৃঙ্খলার অধীন। তাদের জীবন ফুলের মত বিকশিত। কত লোক তাঁদের ভক্তি করতো, মান্য করতো। বুঝতে শিখেছে যে জীবনে বড় হতে গেলে নিয়মের শাসন এড়িয়ে গেলে চলবে না। লক্ষ্মী মেয়ের মত রোজকার রুটিন মার্গারেট মেনে চলতো।

স্কুলকে তার ভালো লাগতো আরো, কেননা, স্কুলের বিরাট বাড়ী। এত বড় বাড়িতে আগে সে থাকেনি। এখানে বড় বড় জানালা। ঘর গুলোয় আসে প্রচুর আলো হাওয়া। স্কুলের সঙ্গে লাগোয়া মস্ত খেলার মাঠ। আর রয়েছে এক পাল মেয়ে। সকলেই একসঙ্গে থাকে, পড়ে, খেলাধূলা করে। খায়দায়, শোয়, গল্প করে। বাড়ীর আবহাওয়া না থাকলেও এও আরেক ধরনের জীবন। সকলের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলায় অনেক মজা। ঘন্টার সঙ্গে মিলিয়ে সব কাজ করতে হয়। খাওয়া, শোওয়া, পড়তে যাওয়া, খেলা। তবু একঘেয়ে লাগে না।

প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মিস ল্যারেট। মিস ল্যারেট ভীষণ ভাবে নিয়মকানুনের ভক্ত। গীর্জার স্কুলে তাঁর শিক্ষা। মেয়েদের কোনরকম বিচ্যুতি তিনি সহ্য করতেন না। যে মার্গারেট সব রকম নিয়মকানুন মেনে চলতে চেষ্টা করতো, স্কুলের পড়ার থেকেও বেশী পড়া এগিয়ে রাখতো, তাকেও সামান্য ক্রটিতেই মিস ল্যারেট শাসন করতেন। আশ্চর্য! এনিয়ে মার্গারেটের মনে কোন ক্ষোভ হত না। কেননা, তখন থেকেই তার মন তৈরী হয়ে

রয়েছে। একবার কী একটা কারণে মিস ল্যারেট মার্গারেটের রাশী করা সোনালী চুল খুব ছোট ছোট করে কেটে দিয়েছিলেন। এই সব ছোট বড় শাস্তি পেয়েও মার্গারেটের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতো না। জানতো তাকে একদিন বড় হতে হবে—অনেক বড়। এখন এই সব শাস্তির কথা ভাবতে আরম্ভ করলে শুধু মনই খারাপ হবে, নিজের যা কাজ তা আর কোনদিনও করা হবে না।

কড়া শাসনের মধ্যে থেকেও মার্গারেট তাই স্বপ্ন দেখার অভ্যাস ছাড়েনি। স্কুলের বন্ধন থেকে ওর মন চলে যায় কল্পনার পাখা মেলে। কখনো ভবিষ্যৎকে চোখের সামনে রেখে স্বপ্ন দেখা শুরু করতো। কখনো চলে যেত নিজের পড়া গল্পের রাজ্যে। স্কুলের পড়া ছাড়াও বাইরের অনেক বই সে সময় পেলেই পড়ে নিত। বাইবেলের গল্প। রূপকথার গল্প। এই গল্প তার বান্ধবীদের পাশে বসিয়ে ফলাও করে বলতো। মার্গারেটের গল্প বলায় অনেক ধরণের মজা ছিল। গল্পের নায়ক নায়িকা সে নিজেই সেজে যেত। অঙ্গ ভঙ্গি করে, গলার স্বর বদল করে গল্প বলার মধ্যে কত রকম যে বৈচিত্র্য আনতো, মেয়েরা তাই মার্গারেটকে ছাড়তেই চাইতো না। সময়ে অসময়ে ঘিরে ধরতো। গল্প শুনতো, নাটকও হোত। একদিন হয়েছে কি শয়তান আর দেবদূতের লড়াই চলেচে। ঘোর লড়াই। শয়তান হেরে গিয়ে হার স্বীকার করে না। দেবদূত ধরেছে চেপে। শয়তান এবার যাবে কোথায়। মেয়েরা অবাক হয়ে দেখছে। মার্গারেট তখন শয়তানের পাঠ নিয়েছে। শয়তানকে কাবু করতে গিয়ে দেবদূত শয়তানের চুলের মুঠি জাপটে ধরেছে। এটা দেখাতে গিয়ে মার্গারেট নিজের চুলই টেনে ছিঁড়ে ফেললো। মেয়েরা দেখে অবাক। এমনি ভাবেই মার্গারেট মেয়েদের মন জয় করে রাখতো।

আরেকটা গল্প মার্গারেটের খুব প্রিয় ছিল। তার বন্ধুরা অনেকবার শুনেছে তার মুখ দিয়ে। উপভোগও করেছে। গল্পটা এই রকম: একদিন এক মাতাল চলতে চলতে টলে পড়ে গেল এক গর্তের মধ্যে। অন্ধকার গর্ত। অনেক কষ্ট করে সে দেয়াল ধরে ওপরে উঠে আসছে অমনি একটা পিপেয় মাথা ঠুকে আবার পড়ে গেল গর্তের মধ্যে। ওপরে রয়েছে আরো কতকগুলো পিপে। তারা এই দেখে হেসেই গড়াগড়ি খায়। ক্রমাগত তারা হাসতে থাকে আর গড়াতে থাকে, আর বলে, আরো গড়াগড়ি খাও ভাই, আরো গড়াও, তখন যে পিপেটা মাতালকে ধাক্কা মেরেছিল সেটা ঝুলতে ঝুলতে এসে ঠিক মাতালটার উপর গড়িয়ে পড়লো। মাতালটা তখন পিপেটাকে মুখ ভেঙিয়ে উঠলো, গড়াতে গড়াতে পিপের থেকে দূরে সরে গিয়ে বোঁ করে উঠে পড়ে খোঁড়া পায়ে দিল এক লম্বা ছুট। এই গল্প শুনে মেয়েরাও হেসে গড়াগড়ি খেত।

একদিন মিস ল্যারেট স্কুল ছেড়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন নতুন একজন। নতুন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। ইনি সম্পূর্ণ অন্য জগতের লোক। নাম মিস কলিন্স। মিস ল্যারেটের মত তিনি নন। অনেক পড়াশুনো করেছেন। মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেশেন। মেয়েরাও মিস কলিন্সকে বেশ পছন্দ করতো। আর মার্গারেটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেক হৃদ্যতায় এসে পৌচেছিল। মার্গারেট মেধাবী ছাত্রী। বুদ্ধিমতী ও স্মার্ট। পড়াশুনোয় সবার চেয়ে এগিয়ে থাকে। এমন মেয়েকে ভাল না বেসে পারা যায় কি। মিস কলিন্স ওকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করতেন। তিনি মার্গারেটের মধ্যে ভবিষ্যতের এক সম্ভাবনার ইংগিত দেখেছিলেন। তাই অনেক সময়ে নিজের কাছে ডেকে নানান কথা বলতেন। উপদেশ দিতেন। জীবনে বড় হওয়ার নানান আদর্শের সন্ধান দিতেন। মার্গারেটও এমন সহানুভূতি

শীল শিক্ষিকার সন্ধান পেয়ে তার মনের সব প্রশ্ন উজাড় করে দিত। মিস কলিন্স সব কিছুই সাধ্যমত জবাব দিতেন। মার্গারেটের কৌতুহল মিটিয়ে তার মনে আরো প্রশ্নের উৎসুক্য জাগিয়ে তুলতেন। যেমন আদর্শ শিক্ষিকা তেমনি তাঁর ছাত্রীও।

মার্গারেটের চিন্তার বিকাশ কোন সাধারণ ছাত্রীর মত ছিল না। কোন তের বছরের মেয়ের মতো তো নয়ই। বিশেষ করে মিস কলিন্সের প্রভাবে অনেক ব্যাপারেই তার নিজস্ব মতামত গড়ে তোলার কিংবা স্বাধীন চিন্তার স্ফুরন হবার সুযোগ এল। ঐ বয়স থেকে একটা বিশেষ চরিত্র অনুযায়ী মার্গারেটের স্বভাব গড়ে উঠতে শুরু করলো।

মিস কলিন্স খুব উঁচুদরের মানুষ ছিলেন। তিনি জানতেন কেমন করে শিক্ষায় রুচিশীলতায় মানুষের মনকে গড়ে তুলতে হয়। তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্রীকে ঠিক সেই রকম ভাবে মানুষ করতে লাগলেন। অধ্যাত্ম জীবনে তার তত্বচিন্তার ঝোঁক দেখে কলাবিদ্যা আর গানে ওর মন টেনে রাখতেন। মার্গারেটের দুই ক্ষমতাই ছিল। ছিল গানের গলা, ছবি আঁকার ক্ষমতাও। সব রকম ভাবে তার সমস্ত সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলার কাজে মিস কলিন্স লেগে রইলেন। কেবল তত্বচিন্তার মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে থাকলে নানান সন্দেহ, জটিল প্রশ্ন আর সংশয়ে জীবন বিস্বাদ হয়ে যেতে পারে তাই গানে ও চারু কলার চর্চায় মন মুক্তি পায়—দূর কল্পলোকের সন্ধান পেয়ে জীবন আবার মধুময় হয়ে ওঠে। মিস কলিন্স মার্গারেটের' আদর্শ শিক্ষিকা।

স্কুল থেকে বছরে দুটো লম্বা ছুটি পাওয়া যেত। জুলাই এর মাঝামাঝি আর বড়দিনের সময়ে। ছুটিতে ফিরে যেত বাড়িতে। দাদু হ্যামিল্টনের কাছে। মা তখন আয়ার্ল্যাণ্ডে বিশেষ থাকতেন না। লণ্ডনে একটা কাজ নিয়েছিলেন। দাদুকে তখন মার্গারেট

নতুন করে দেখতে শিখেছিল। নতুন চেতনা দিয়ে বিচার করার শক্তি এসেছে তার। দাদুর স্বদেশ প্রেম তার গর্বের বস্তু। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলনে গুপ্ত সমিতিও তিনি গড়ে তুলেছেন। রোজ সকাল বেলায় তিনি বেরিয়ে যেতেন। যোগাযোগ করতেন কর্মীদের সঙ্গে। নানারকম নিষিদ্ধ কাগজ বিলি করতেন। চাষীদের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। মার্গারেটের চোখে দাদু হ্যামিল্টন বিস্ময়কর ব্যক্তি ছিলেন।

মার্গারেটের পিতৃবংশে মাতৃবংশে দুই পরিবারেই স্বদেশ প্রীতির গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। এই বংশের মানুষেরা দেশের আহ্বানে সবরকম কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। দুই বংশের ধারাই মার্গারেটের চেতনায় এসে ধরা পড়েছিল। তাই মার্গারেটের চরিত্রে স্বদেশপ্রীতি মানবপ্রেম আর ধর্মবোধ এমন উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। মার্গারেটের খুবই ইচ্ছে হত দাদুর সঙ্গে সঙ্গে দেশের কাজে যোগ দেয়। মার্গারেটের মনের খবর হ্যামিল্টনের অজানা রইলো না। কথায় কথায় তার আগ্রহ প্রকাশ পেয়ে গেল। দেশপ্রেমিক দাদু এমন নাতনী পেয়ে বর্তে গেলেন। দাদুর সঙ্গে মার্গারেটের নানান জায়গায় যাওয়ার সুযোগ এল। দাদু যেমন প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালবাসতেন ঠিক তেমনি ভাবে নাতনীকে দীক্ষা দিলেন।

স্কুলে যখন ফিরে আসতো তখনো ওর মন ভরে থাকতো দেশ সেবার স্বপ্নে। স্কুলের পড়াশুনো ছাড়াও আগ্রহ ভরে পড়তো বিপ্লবীদের স্মৃতি কথা, জীবন কাহিনী, আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী—ইংরেজী সাহিত্যের সেরা বইগুলো। সঙ্গীনীদের নিয়ে খেলা করার ইচ্ছেও কমে যেতে শুরু করেছে। নিজেকে গুটিয়ে প্রস্তুতির পাঠ চলতে লাগলো। ভবিষ্যতে যে বড় হবে আর পাঁচটা মেয়ের মত তার ছাত্রীজীবন কাটতে পারে না। দুনিয়ার অনেক খোঁজ খবর, হালচালের সংবাদ তাকে রাখতে হবে।

একদিন স্কুলের জীবন শেষ হয়ে গেল মার্গারেটের।

সসম্মানে মার্গারেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। স্কুলের বাঁধন তার কেটে গেল। এখন সে মুক্ত বিহঙ্গ। সুদূর আকাশে অনন্ত নীলিমায় তার মুক্তি। পাখা মেলে এবার তার ঝাঁপ দেবার সময় হয়েছে। সামনে রহস্যভরা জীবন। এগিয়ে চলবার পথ। কোন লক্ষ্যে সে পৌঁছোবে? চলতে হবে নিজের মতে। নিজের বিচার বুদ্ধি, বিবেকের শাসন মেনে জীবনকে মনের মত গড়ে তুলতে হবে। স্কুলে এতদিন একমনে সাধনা করে এসেছে। সেই সাধনার ফল একাকী নিজের ভোগে লাগাবে না। তা ও তুলে দেবে আরো পাঁচ জনের হাতে। বিলিয়ে দেবে দশজনের মধ্যে। সমস্ত শৈশব কাল আর ছাত্রীজীবনে মার্গারেটের সঞ্চয়ের ঝুলিতে যা কিছু জমা হয়েছে তাতে রয়েছে তার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক সম্ভাবনার ইশারা। তার ঠাকুরমা মার্গারেটের ব্যক্তিত্ব, পিতা-পিতামহের দেশপ্রীতি ও ধর্মবোধ, মিস ল্যারেটের শৃঙ্খলানুবর্তিতা, মিস কলিন্সের উদার চরিত্রমাধুর্য, মাতামহের জলন্ত স্বদেশপ্রেম ও সমাজবোধ। সব কিছুই তার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্পদ হয়ে রইলো।

মার্গারেট নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করে নিল। মার্গারেট হবে শিক্ষিকা। মার্গারেট চাকরী পেয়ে গেল কেসউইকের বোর্ডিংস্কুলে। কিন্তু এখানে দুবছরের বেশী থাকতে হয় নি। হঠাৎ একদিন এখানকার কাজ ছেড়ে এক অনাথ আশ্রমে গিয়ে কাজ নিল। শিক্ষয়িত্রী মার্গারেট জীবনের অন্য এক অভিজ্ঞতার স্বাদ নেবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলো। সেবা ব্রতে তার দীক্ষা হোক। মানব প্রেমের যে শিক্ষা সে তার পিতার কাছ থেকে, মাতামহের কাছ থেকে, মিস কলিন্সের কাছ থেকে সঞ্চয় করে রেখেছে এখানে হবে তার উপযুক্ত পরীক্ষা।

সাধারণের কৃপায়, যে সব আশ্রয়হীন সম্বলহীন ছোট ছোট

মেয়েরা জীবন গড়ে তোলার সাধনায় মগ্ন রাগবীর অনাথাশ্রমে, মার্গারেট তাদের ভার নিল। ওর মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে নিজের সেবা ব্রতী আদর্শকে মার্গারেট সার্থক করে তুললো। যেদিন বুঝলো সেবার কাজে তার যোগ্যতা, ক্ষমতা পরীক্ষাত্তীর্ণ হয়েছে সেদিন মার্গারেট আবার স্কুলের জীবনে ফিরে গেল।

রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে মার্গারেটের কাজ হল। এবার শুধু স্কুলের কাজ নয়। শিক্ষাদান ও সেবার কাজ দুই-ই একসঙ্গে চালাবে। এমন জায়গায় স্কুল যেটা ছিল খনি অঞ্চল। এখানে জনকল্যাণের কর্মক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে। শ্রমিক জীবনের দারিদ্র অভাব অনটনে অনেক সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাদের কষ্টের জীবন প্রীতি দিয়ে সহানুভূতি দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে। বিভিন্ন অভাব অভিযোগ সাধ্যমত দূর করতে হবে। বস্তিতে ঘুরে ঘুরে ওর কাজ সুরু হল। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখলো বিস্তর বাধা। সেন্ট—মার্কস্ চার্চের কর্মী হিসেবে মার্গারেট নাম লিখিয়ে ছিল। কিন্তু চার্চের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার বনিবনা হোল না। সেখানে নানারকম বিধি বিধান আর বাঁধাবাঁধি। সাহায্যের বেলায়ও বাছবিচার পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। সত্যিকারের সেবাব্রতীর কাছে এ জিনিস চলে না।

চার্চের কর্মীসঙ্ঘ থেকে নাম কাটিয়ে এসে মার্গারেট কলম ধরলেন। সমাজ সেবার খুঁটিনাটি নিয়ে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কয়েকটা নিবন্ধ তিনি সংবাদ পত্রে পাঠিয়ে দিলেন। যথারীতি তা প্রকাশিত হয়েছিল। মার্গারেটের কলমের জোর অল্পদিনেই বোঝা গেল। তরুণ বয়সের সমস্ত উদ্যম নিয়ে মার্গারেট লেখার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। মার্গারেটের লেখায় সরকারী ও বেসরকারী মহলে সাড়াও পড়ে গেল। স্থানীয় সমস্যা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে চাঞ্চল্য এলো, ফলে রেক্সহ্যাম শহরে সাধারণের জন্যে চিকিৎসালয় স্থাপিত হল,

চলন্ত লাইব্রেরী চালু হল, আরও নানারকম সামাজিকও মংগলজনক কাজে সকলের আগ্রহ এল।

এই উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়ে একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মার্গারেটের আলাপ হয়। এই আলাপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বায় পরিণত হয়েছিল। মার্গারেটের জীবনে এঁর সঙ্গে পরিচয় এক বিশেষ ঘটনা। কিন্তু পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠতর হবার আগেই খুব শীগ্‌গীরই একদিন দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুটির মৃত্যু হল। এই মৃত্যুকে শান্ত ভাবে গ্রহণ করে মার্গারেট রেক্সহাম শহর থেকে সরে যেতে ইচ্ছে করলেন, বন্ধুর সঙ্গে এই বিচ্ছেদ মার্গারেটের অসহ্য ঠেকেছিল।

এবার কর্মস্থল হল চেষ্টার। চেষ্টারে এসে মার্গারেট তাঁর ভাবনা চিন্তার ধারা পাল্টে দিলেন। মন ঝুঁকে পড়লো শিশুশিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতির দিকে। বাচ্ছাদের শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকজন মনীষীর ভাবনা নিয়ে সে সময় কেউ কেউ চিন্তা করছিলেন। এঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন বিখ্যাত—যোহান হাইনরিখ পেস্তালোৎসি (১৭৪৬ ১৮২৭) ও ফ্রিডরিখ ফ্রয়বেল (১৭৮২-১৮৫২)।

পেস্তালোৎসি ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের লোক। নিজে স্কুল করেছিলেন সে স্কুল চালাতে না পেরে অন্য এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ নিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম দেখালেন শিশুদের মনের প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা দিলে তাদের সুষ্ঠু পরিণতি ও বিকাশ সম্ভব হয়। বড় হয়ে তারা স্বচ্ছ দৃষ্টি আর মুক্ত চিন্তার অধিকারী হতে পারে।

মনীষী ফ্রয়বেল আঠারো শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতির জনক তিনি। এঁর গুরু ছিলেন পেস্তালোৎসি। খেলা এবং কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করে শিক্ষার জগতে যুগান্তর এনেছেন। আধুনিক শিশু

শিক্ষার ধারা ফ্রয়বেলের উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে অনুসরণ করেই তৈরী হয়েছে।

শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে যাঁরা নতুন চিন্তা করতেন পেস্তালোৎসি আর ফ্রয়বেল তাঁদের কাছে আদর্শ। তাঁদের চিন্তা অনুসরণ করে কোন কোন শিক্ষাবিদ নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষায় মগ্ন হন। মার্গারেট নতুন জায়গায় এসে ওদের খুঁজে বার করলেন। মার্গারেট দেখলেন শিক্ষাদানের ব্যাপারে এতদিন পরে তিনি সঠিক রাস্তায় এসেছেন। দেখলেন, এখানে কাজ করার অনেক কিছু রয়েছে। একেবারে ছোটদের দিয়েই শুরু করতে হবে। শিশুরা কেবল মাটির পুতুলের মত অচেতন জিনিশ নয়। তাদেরও কচি হৃদয়, বুদ্ধিবৃত্তি, চাতুর্য ও দৃষ্টি ক্ষমতা আছে। সীমাবদ্ধ এই সব শক্তির আধার অসীম সম্ভাবনায় ভরিয়ে তুলতে হবে। তাদের অনুরাগ, মনের প্রবণতা, চিন্তার গতি কোন দিকে এই সব লক্ষ্য করে প্রত্যেকের মনের আদর্শ অনুযায়ী, প্রয়োজন অনুযায়ী, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সব কাজের মধ্যে লিভারপুলে যে সব তরুণ অক্লান্ত কর্মী মগ্ন ছিলেন মার্গারেট তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। যোগাযোগ রাখলেন। কয়েকজন আদর্শবাদী মানুষের সঙ্গে পরিচয় হোল। এঁদের ছিল "গুড সানডে ক্লাব"। এই ক্লাবে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা বসতো। সাহিত্যের আলোচনা। সামাজিক সমস্যার আলোচনা। কয়েকজন তরুণ লেখক এই সঙ্ঘের প্রাণ—স্বরূপ ছিলেন। তাঁদের উৎসাহে মার্গারেট আবার লেখার কাজ শুরু করলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ছদ্মনামে লেখা চালাতে লাগলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের সামাজিক সমস্যা ও মুক্তি যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে উদ্দীপনাময়ী রচনা তৈরী করলেন। লিখতে লিখতে যোগাযোগ হয়ে গেল "ফ্রী আয়ার্ল্যাণ্ড" নামে বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের সঙ্গে। মার্গারেটের স্বদেশে তরুণ ও যুবজনের কাছে এদের প্রভাব ছড়িয়ে

পড়েছিল। দেশ বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে এঁরা যোগাযোগ রাখতেন।

একদিন ওদের কাছে এলেন প্রিন্স পিটার ক্রপটকিন। ক্রপটকিন (১৮৪২—১৯২১) তখন রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতা। রাশিয়ার জারের রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে জনতার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। গণআন্দোলন ও বিপ্লবের সমস্যা নিয়ে তাঁর বিখ্যাত বই আছে। এই সব বই—এর রচনায় আর গুপ্ত বিদ্রোহ পরিচালনায় নায়কের আসনে থেকে তিনি দেশ বিদেশে পরিচিত হয়েছিলেন। রাশিয়ার অত্যাচারী শাসকদের কাছে তিনি সাঙ্ঘাতিক লোক। তাঁর স্বদেশে বাস করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশ বিদেশের বিদ্রোহীরা তাঁকে গুরু বলে মানতেন।

ক্রপটকিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই মার্গারেট বুঝে নিলেন এই সেই লোক যাকে বিপ্লবের গুরু বলে মানা চলে। মার্গারেট জাতীয় বিপ্লবের এক আদর্শের সন্ধান পেলেন। ক্রপটকিন থাকতেন ঈলিংয়ের ছোট্ট একটা বাড়ীতে। তা হল বিপ্লবীদের তীর্থক্ষেত্র।

মার্গারেট সেখানে যাওয়া আসা শুরু করলেন। বিপ্লবের কর্মপদ্ধতি, তত্ত্ব, গতি পরিণতি, অনেক কিছু জানার আছে। মার্গারেট এতদিন শুধু আবেগের প্রেরণায় চলেছিলেন। কিন্তু সার্থক মুক্তি আন্দোলনের পেছনে অনেক জিনিসই আছে যা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখতে হয়। কাজে লাগাতে হয় বিপ্লবের প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজনে। এসব ব্যাপারের সন্ধান একমাত্র ক্রপটকিনের কাছেই পাওয়া গেল। ক্রপটকিনকে আদর্শ করে মার্গারেট ও তাঁর সহযোগী বন্ধুরা স্বদেশের স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে মনোযোগ দিলেন।

এই সময়ে মার্গারেট উইম্বলডনে নিজেই একটা স্কুল খুললেন। এই স্কুলে পড়তে আসবে কেবল শিক্ষকেরা। শিশুদের শিক্ষাদানের নতুন পদ্ধতি নিয়ে এখানে চর্চা করা হবে। কেমন করে পড়াশুনোর ব্যাপার ছোট ছেলেদের কাছে আকর্ষনীয় করে তোলা যায় তাই এখানে শেখানো হবে। এই ধরণের কাজে অনেকের আগ্রহ দেখা গেল। ইংলণ্ডের পণ্ডিত ব্যক্তিদের নজরও তখন এই দিকে পড়েছে। পণ্ডিতব্যক্তিরা অনেকেই মার্গারেটের সঙ্গে পরিচয় করলেন। মার্গারেটের চেষ্টা অল্পদিনের মধ্যেই সার্থক হয়ে উঠলো।

এই স্কুল করতে গিয়ে মার্গারেট একটা নতুন বিদ্যা শিখে ফেললেন। তা হল ছবি আঁকা। শিশুদের কাছে ছবির আকর্ষণ খুব। রঙচঙে ছবির সাহায্যে তাদের শিক্ষা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। ছবি এঁকে পড়াতে পারলে পড়াশুনোর ব্যাপার শিশুদের কাছে নীরস লাগে না। তাই ছবি আঁকার ব্যাপার স্যাপার মার্গারেট খুবই মনোযোগ দিয়ে শিখে নিলেন। আর এমন পারদর্শী হয়ে উঠলেন যে ভবিষ্যতে ছবির ভালমন্দ বিচারে মার্গারেটের বিচক্ষণতা পৃথিবীর নামজাদা শিল্পীরাও মেনে নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের চিত্রশিল্পের উন্নতির ইতিহাসে মার্গারেটকে ভারতের শিল্পীরা কোনদিন ভুলতে পারবে না। কোনদিন ছবি না আঁকলেও তাঁর ভারতীয় ছবির আলোচনা আর শিল্পীদের উৎসাহ দান চিরদিন আমাদের মনে রাখতে হবে।

এই স্কুলে কাজ করতে করতে মার্গারেট ইংলণ্ডের অনেক প্রতিভাবান আর শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে পরিচিত হলেন। একদল আদর্শবাদী যুবক তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে উঠলেন। এঁদের সকলকে নিয়ে আসর তৈরী হল। এখানে নিয়মিত আলোচনা সভা বসতো। আলোচনা হত সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে।

মার্গারেট ছিলেন আসরের মধ্যমণি। ইংলণ্ডের অনেক নামী

ব্যক্তি, শিল্পী, সাহিত্যিকেরা ও পত্রিকা সম্পাদকেরা এই আলোচনা সভায় আসতেন। এখানে বিখ্যাত লেখক বার্ণাড শ এসেছেন। বিদগ্ধ বিজ্ঞানী টমাস হাক্সলী এসেছেন। এসেছেন আরো অনেকে।

এই আসরের নাম ছিল 'সিসেম ক্লাব'। মার্গারেট ক্লাবের মধ্যমণি। ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন 'আর ম্যাকনীল' নামে একজন তরুণ সাহিত্যিক। সেন্ট জেমস্ গেজেট পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক। ম্যাকনীলের সঙ্গে মার্গারেটের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, বিয়ের কথাও উঠেছিল। কিন্তু ম্যাকনীলের ব্যবহারে মার্গারেটের মন ভেঙ্গে যায়।

ম্যাকনীল বিয়ে করেন অন্য একটি মেয়েকে।

মার্গারেটকে চিত্রবিদ্যা শেখাতেন এবেনজার কুক। একদিন কুক এসে খবর দিলেন লেডি ইসাবেল মার্গসনের বাড়িতে একজন হিন্দু সন্ন্যাসী আসবেন। ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন। লেডী মার্গসন কয়েকজন বন্ধুকে ওনার বাড়ীতে যেতে বলেছেন। মার্গারেটকেও যেতে হবে। সিসেম ক্লাবে সেদিন এই হিন্দু সন্ন্যাসী-কে নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। তবে পরিষ্কার কোন কথাই সেদিন এঁর সম্পর্কে জানা গেল না। কিন্তু সকলের কৌতূহল বেড়ে গেল। মার্গারেটের কৌতূহল বাড়লেও এই সন্ন্যাসী সম্পর্কে কোন গুরুত্ব দিতে মন চাইলো না। তবু ঠিক করলেন সেই সভায় যাবেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। নভেম্বরের সন্ধ্যা। লেডী মার্গসনের ড্রইংরুমে মনোরম পরিবেশে জ্বলন্ত আগুনের চুল্লী। শ্রোতারা এসে উপস্থিত হয়েছেন। খুব বেশী ভীড় হয়নি। বেশীজনকে বলাও হয়নি। বেছে বেছে ডাকা হয়েছে

পনের কি ষোলজন শ্রোতাকে। মার্গারেট এসেছেন সকলের শেষে।

এবার এলেন স্বামীজি স্বয়ং। দীপ্তিময় চেহারা। উন্নত মস্তক। গেরুয়া আলখাল্লা গলা থেকে পা পর্যন্ত নামানো। মাথায় পাগড়ী। শান্ত সমাহিত দৃষ্টি। গম্ভীর আনন। তাঁকে বসানো হল সকলের মুখোমুখি।

স্বামীজি বলতে উঠলেন প্রথমেই শিবমন্ত্র উচ্চারণ করে। তাঁর দৃপ্ত ভঙ্গিমায় সবারই চমক লাগে। কণ্ঠে রয়েছে আত্মপ্রত্যয়ের সুর। সুরেলা গলায় সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি করলেন। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা সকল শ্রোতার কাছেই। এর মধ্যে বিস্ময় আছে, চমক আছে।

স্বামীজি যে সব কথা বললেন, হিন্দুধর্মের সেই সব বক্তব্যের পেছনে যেমন তর্কবিচার আছে, তেমনি রয়েছে সংশয়হীন আত্ম-উপলব্ধি। যারা পরিণতি বয়সে বিচার বুদ্ধি নিয়ে হিন্দুধর্মের তত্ত্ব কথা শুনতে শুরু করবে তাদের মনে সংশয়ের দ্বন্দ্ব চট করে দূর হবে না। আর তা ছাড়াও বিশেষ করে মার্গারেটের মন। মার্গারেট সমাজকর্মী। তার সকল কাজ কর্ম, ভাবনা চিন্তার পেছনে রয়েছে বিচারশীল যুক্তিবাদী মন। এই বিদেশী সন্ন্যাসীর বক্তব্যে মৌলিকত্ব কিছু নেই বলেই তাঁর মনে হয়েছিল। তবু মার্গারেট স্বামীজির বিশ্বাসের কথা, স্বামীজির উপলব্ধি, মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারলেন না।

আর তিন সপ্তাহ রইলেন স্বামীজি ইংলণ্ডে। এর মধ্যে অনেক সভায় তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। তাঁর কথা শোনার জন্যে ক্রমশ লোকের আগ্রহ বাড়ে। সভাগুলোয় ভীড়ও বাড়তে থাকে। লণ্ডনের দৈনিক সব কাগজ এই হিন্দু সন্ন্যাসীর খবর আগ্রহ নিয়ে ছাপতো। বিবেকানন্দের আগমন এক আশ্চর্য চমকের মত ঠেকেছিল। বিশেষ করে এরই দু বছর আগে শিকা-

গোর ধর্ম মহাসভায় বিশ্বজয়ের কাহিনী লণ্ডনের লোকেরা ভোলেনি। বিবেকানন্দকে মনে হতে লাগলো নতুন যুগের বুদ্ধ। লণ্ডনের কাগজগুলো সেই রকম ভাবেই লিখতো। সভায় সভায় আমন্ত্রণ আর সংবর্ধনা বেড়ে গেল।

মার্গারেটের সংশয়ী মন জয় করা সহজ ছিল না। তবু কিসের আকর্ষণে বিবেকানন্দের সভায় মার্গারেট পরম নিষ্ঠা নিয়ে যোগ দিতেন? মন দিয়ে শুনতেন তাঁর বক্তব্য। লিখেও আনতেন। পরে অনেকখানি সময় দিয়ে বিচার করতে বসতেন যা শুনেছেন। সংশয়ে অবিশ্বাসে অনেক কথাই তিনি মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু যুক্তি দিয়ে যখন স্বামীজির বেদান্ত ব্যাখ্যা বিচার করতেন তখনই ঘটতো তাঁর বুদ্ধির পরাজয়। পাশ্চাত্যের দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা নিয়েও বেদান্তের সার কথাকে উড়িয়ে দিতে পারতেন না। বেদান্তের পরম সত্যের কাছে এসে তাঁর চিন্তার স্রোত যেত থেমে। বিচার শক্তি আর এগোত না।

স্বামীজি বলেছিলেন, মানুষ কী চায়? কী পায়? কেবল সুখ? কেবল দুঃখ? শুধু সুখ বা দুঃখ নয়। সুখ দুঃখ দুই-ই পায়। কিন্তু মানুষের চাই মুক্তি। সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে মুক্তি। মুক্তির চাওয়া মানুষের পরম চাওয়া। কোন বাঁধনের মধ্যে ধরা না দিয়ে বিশ্বজগৎ আপন করে নেওয়ার মধ্যে যে মাধুরী, উপলব্ধি, তাতেই পাওয়া যাবে মুক্তির স্বাদ।

ধীরে ধীরে মার্গারেটের মনে পরিবর্তনের লক্ষণ পরিস্ফুট হতে থাকলো। মার্গারেট বুঝলো বিবেকানন্দের উপলব্ধি দেশকাল পাত্রের মধ্যে বাঁধা পড়েনি। তিনি অসীমের পূজারী। অনন্তের সাধনায় মগ্ন। কিন্তু এই সাধনায় তিনি কী পাবেন? এখানে কোনো বন্ধন নেই, মোহ নেই, কোনো চাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা নেই, তবু তেমন ভাবে দেখতে শিখলে বোঝা যায়—এখানে

বন্ধনও আছে, সে বন্ধন বিশ্বজগতের মংগলের জন্য। এখানে মোহ আছে, সে মোহ নিজের স্বার্থসুখের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। এখানে চাওয়া আছে, কিন্তু সে চাওয়া দশ দিকে দান করে ফতুর হয়ে যাবার জন্যই। মার্গারেট মনে মনে বিবেকানন্দকে আচার্যদেব বলে স্বীকার করে নিলেন।

বিবেকানন্দ লণ্ডন থেকে আমেরিকায় চলে গেলেন। মার্গারেট খুলে বসলেন গীতা আর বাইবেল। নতুন করে তাঁর পড়া শুরু হল। উপনিষদ জোগাড় করে পড়তে শুরু করলেন। হিন্দু ও বৌদ্ধমতবাদের সীমাহীন ধ্যান ধারনায় নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

পাঁচ মাস বাদে স্বামীজি আবার ফিরে এলেন। মিঃ ই, টি স্টাডি ছিলেন ইংলণ্ডে স্বামীজীর অত্যুৎসাহী ভক্ত। স্বামীজীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে লণ্ডনে ধারাবাহিক ক্লাসের ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগের ওপর স্বামীজি পরপর বক্তৃতা দিলেন। এ ছাড়া তাঁকে বিভিন্ন ক্লাবে আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে যোগদান করতে হোত। সমস্ত ক্লাসেই মার্গারেট নিয়মিত ভাবে যোগ দিতেন। তাঁর যা কিছু দ্বিধা ও সংশয় এক এক করে কেটে যেতে লাগলো। যেখানে মনের মধ্যে প্রবল ছিল বিরোধী যুক্তি সেখানে হাজির হল আত্ম সমর্পনের ভাব। জগৎ, জীবন সম্বন্ধে উদাসীন থেকে ত্যাগের মাহাত্ম্য বড় হয়ে উঠলো।

একটা ঘর ছাড়া আহ্বানের জন্য মার্গারেট আকুল হয়ে রইলেন। স্বামীজীর মহৎ আদর্শের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করে দেবেন তিনি। মার্গারেটের মনের অস্থিরতা স্বামীজির কাছেও অজ্ঞাত ছিল না। ভারতের সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য দূর করার জন্যে—'বহুজন হিতায়

বহুজন সুখায়' আত্মোৎসর্গের জন্যে স্বার্থশূন্য অসংখ্য কর্মীর প্রয়োজন।

৭ই জুন স্বামীজি মার্গারেটকে এক চিঠি লিখলেন, "তোমার মধ্যে একটা জগৎ আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে। ধীরে ধীরে আরো অনেক শক্তি আসবে। আমরা চাই—জ্বালাময়ী বাণী এবং তার চেয়ে জ্বলন্ত কর্ম। হে মহাপ্রাণ ওঠো, জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। তোমার কি নিদ্রা সাজে?" এই আহ্বান উপেক্ষা করা সাধ্য ছিল না মার্গারেটের। কিন্তু স্বামীজির কাছে নিজের সংকল্পের কথা জানাতে গিয়ে সঙ্কোচ দেখা দিত। তাঁর অনুরোধে স্বামীজির অনুরাগী ভক্ত মিস্ মুলার মার্গারেটের সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে দিলেন।

মার্গারেট মন স্থির করে ফেলেছিলেন। স্বামীজি ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন। কিন্তু এ যাত্রায় স্বামীজির সঙ্গে তাঁর যাওয়া হয়ে উঠবে না। মার্গারেটের এখন অনেক বন্ধন রয়েছে। রয়েছে নিজের প্রতিষ্ঠা করা স্কুল—সিসেম ক্লাবের দায়িত্ব—সংসারের দায়িত্ব। এসব এখনই উপেক্ষা করা চলে না। এসবের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেই তিনি যাবেন। এক বছরের মত সময় লেগে যাবে।

১৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৬, স্বামীজি জাহাজে চাপলেন। এবারে সঙ্গী হলেন সেভিয়ার দম্পতি। ক্যাপ্টেন জে, এইচ, সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী। এঁরা জাতিতে ইংরেজ। স্বামীজির বিশেষ অনুরাগী ভক্ত। বেদান্ত প্রচারের জন্যে জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছে নিয়ে ভারতবর্ষে আসতে ব্যাকুল হয়েছিলেন। এঁরা দুজনেই স্বামীজিকে নিজের সন্তানের মত দেখতেন। হিমালয়ের ওপর মায়াবতীতে এঁরা স্বামীজির নির্দেশে অদ্বৈত আশ্রম গড়ে তোলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে আরো দুজন ছিলেন। মিঃ জে, জে, গুডউইন, মিস হেনরিয়েটা মুলার ও তাঁর সঙ্গী মিস বেল। গুডউইন

সাহেব স্বামীজির একান্ত সচিব ছিলেন। স্বামীজির বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁর অনুগত শিষ্য হয়ে ওঠেন। স্বামীজির বহু বক্তৃতা সাংকেতিক লিপিতে লিখে রাখেন। তিনি স্বামীজির সঙ্গ ছাড়া হতেন না। স্বামীজির প্রতি তাঁর সজাগ সস্নেহ দৃষ্টি সর্বদা উন্মুখ ছিল। বিলেতে মিস মুলারের বাড়ীতে স্বামীজি অনেকদিন অবস্থান করেছিলেন। বেলুড়ে মঠ স্থাপনের কাজে মিস মুলারের অর্থ সাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের নিয়ে স্বামীজি ভারতবর্ষে চলে এলেন। সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন মার্গারেট। এবারে লণ্ডনে এলেন স্বামী অভেদানন্দ। মিঃ স্টার্ডি আর মার্গারেট অভেদানন্দজিকে বেদান্ত প্রচারের কাজে সাহায্য করতে লাগলেন।

উইম্বলডনেও মার্গারেট বেদান্ত প্রচার সমিতি স্থাপন করলেন। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বেদান্ত প্রচারের কাজ ইংলণ্ডে বেশী দিন চললো না। মার্গারেটের মন পড়ে রইলো ভারতবর্ষে। তাঁর ভারতবর্ষে আসার আকুলতা স্বামীজির অজ্ঞাত ছিলনা। কিন্তু মার্গারেটকে নিঃসঙ্কোচে ভারতবর্ষে আসার জন্যে আহ্বান জানানো স্বামীজির পক্ষে শক্ত ছিল। নানারকম অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর মনে হয়েছিল এখানকার জল হাওয়া, আচার বিচার দেশজ সংস্কার মার্গারেটের হয়তো ভাল লাগবে না। মার্গারেটের শিক্ষা, দীক্ষা, মানসিক গঠন ভারতীয় পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে না। এমন ধারণা করেই তিনি একবার লিখেছিলেন…"তুমি এখানে না আসিয়া ইংলণ্ড হইতেই আমাদের জন্য বেশী কাজ করিতে পারিবে। দরিদ্র ভারতবাসীর কল্যাণে তোমার বিপুল আত্মত্যাগের জন্য ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।"

কিন্তু মার্গারেট তাঁর সংকল্পে একনিষ্ঠ। ভারতবর্ষই তাঁর কর্মক্ষেত্র। ভারতের জন্যেই তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন। মিস মুলারকে তিনি নিজের দৃঢ় বিশ্বাসের কথা জানালেন। মিস

মুলার আলমোড়া থেকে চিঠি দিলেন স্বামীজিকে। মার্গারেটের ব্যাকুলতা স্বামীজির অন্তর স্পর্শ করল। তিনি মত পরিবর্তন করে মার্গারেটকে লিখলেন,"...কর্মে ঝাঁপ দেবার পূর্বে বিশেষ ভাবে চিন্তা ক'রো এবং কাজের পরে যদি বিফল হও কিংবা কখনো কর্মে যদি বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো যে আমাকে আমরণ তোমার পাশেই পাবে—তা তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ কর আর নাই কর, বেদান্ত ধর্ম ত্যাগ কর আর ধরেই থাকো।"

পরে আরো উৎসাহ দিয়ে লিখলেন,..."তোমাকে অকপট ভাবে বলিতেছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভারতের কার্যে তোমার অশেষ সাফল্য লাভ হইবে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ নারী সমাজের জন্য, পুরুষ অপেক্ষা নারীর—একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী নারীর জন্মদান করিতে পারিতেছে না। তাই অন্য জাতি হইতে তাহাকে ধার করিতে হইবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম প্রীতি, দৃঢ়তা এবং সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তই তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করিয়াছে।"

এতদিনে স্বামীজির সাদর আহ্বান এসে পৌঁছোল। মার্গারেট ইংলণ্ডের সমস্ত বন্ধন কাটিয়ে তৈরী হয়ে নিলেন। যাত্রার দিন আগত হয়ে এল। মার্গারেটের মা মেরী নোবল কোন আপত্তি জানাতে পারলেন না। কেননা মেয়ের কোন বড় কাজে তিনি বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না—মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্বামীর এমন অনুরোধে তিনি সায় দিয়েছিলেন।

মার্গারেট যেদিন উইম্বলডন ছেড়ে চলে এলেন সে দিনটি ছিল ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। কুয়াশার মধ্য দিয়ে তাঁর যাত্রা

শুরু হল। মনে ছিল দৃপ্ত আত্মবিশ্বাস, ভবিষ্যৎ যতই অজানা হোকনা কেন।

জাহাজ ত্যাগ করল য়ুরোপের উপকূল। নতুন জীবনের উদ্দেশে এই যাত্রা, আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব, পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে এসে এ কোন অজানার সন্ধানে পাড়ি দিলেন মার্গারেট। য়ুরোপের ইতিহাসে, ভারতের ইতিহাসেও এ এক অতুলনীয় ঘটনা। এতদিন য়ুরোপ থেকেই প্রচারকেরা এসেছেন দলে দলে। ভারতবাসীর মনের অন্ধকার দূর করার অহমিকাই ছিল তাদের মূলধন। ভারতবর্ষকে অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে আসার অহমিকা। ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতার কাছ থেকে কোন তত্ত্ব গ্রহণ করার, শিক্ষা করার আগ্রহ তাঁদের ছিলনা। তবু ভারতবর্ষের জ্ঞান সম্পদের পরিচয় গ্রহণ করেননি এমন ইংরেজ যে ছিলেন না তা নয়, তবে শুধুমাত্র ভারতীয় তত্ত্ব বিদ্যা আর যুগ যুগ ব্যাপী সাধনাকে আত্মস্থ করার মানসে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করার মহনীয় ঘটনা ইংরেজ রাজত্বে এই প্রথম। সেই কোন বৌদ্ধ যুগে এমন ব্যাপার ঘটেছিল। নদী বন মরু পর্বত ডিঙিয়ে দেশ বিদেশের তাপসেরা তখন আসতেন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা আপন করে হৃদয়ে ভরে নিয়ে জীবন ধন্য করতেন। তারপর বহু শতাব্দী গত হয়েছে। ভারতের চিরকালের সম্পদ, সত্যের সাধনা ভারতের কুটিরে কুটিরে জ্ঞানী মহাজ্ঞানীর আত্মপ্রচারহীন তপস্যায় গুহায়িত হয়েছিল। তারপর এলেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ সিংহশিশু। বিবেকানন্দ সূর্যের সন্তান। সূর্যের মতই দীপ্ত তেজে তিনি চতুর্দিকে আলোক বিকীর্ণ করে দিলেন। ভারতের শাশ্বত সাধনার আলোক। সেই আলোকের অভিসারেই মার্গারেটের মহাযাত্রা।

মার্গারেট যেদিন ইংলণ্ড ত্যাগ করেন সেদিন চারিদিক ছিল ঘন

কুয়াশায় ঢাকা। কুয়াশার মধ্যে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল ইংলণ্ডের উপকূল। আত্মীয়স্বজন, পরিচিত বন্ধুজন চোখের জলে মার্গারেটকে বিদায় দিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি নিদারুণ বেদনা হয়ে দেখা দিল। দেখা দিল সংশয়ের কালো ছায়া হয়ে। মনে হল কোনো ভুল হয়ে গেল না তো! লণ্ডনের বিদ্বৎ-সমাজে মার্গারেটের প্রতিষ্ঠা কম ছিল না। আইরিশ বিপ্লবের তিনি নেত্রী ছিলেন। ইংলণ্ডে নবযুগের শিক্ষা ব্যবস্থার পুরোধা ছিলেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় চিন্তাশীল রচনার লেখিকা ছিলেন। জীবনে প্রতিষ্ঠা প্রায় করায়ত্ত ছিল। ঠিক এমনি সময়ে সব কিছু ত্যাগ করে রহস্যময় জীবনের এ কোন অন্ধকারে তিনি ঝাঁপ দিলেন?

ঢেউয়ের দোলায় দোদুল্যমান জাহাজের কোলে মার্গারেটের মনও দুলে ওঠে।

সাত সমুদ্র পেরিয়ে জাহাজ এসে পৌঁছোলো কলকাতা বন্দরে। ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৮। বন্দরে মেলা লোকের ভীড়। নানা রঙের পোষাকে, শাড়ীতে, টুপীতে অপরূপ রঙের মেলায় বন্দরের আসর জমজমাট। মার্গারেটের চোখে চকিত বিস্ময়ের ঘোর! এই অজানা দেশ! ভীড়ের ঠেলাঠেলি। হৈ চৈ! এমন সময়ে দেখা গেল স্বামীজিকে। গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, সকলের থেকে বিশিষ্ট হয়ে আছে তাঁর আবির্ভাব। যাঁকে কেন্দ্র করে মার্গারেটের জীবনের সাধনা বিকশিত হয়ে উঠবে সেই মানুষটি সহাস্য মুখে এসে দাঁড়ালেন। গেরুয়া পরা আরেক জন সন্ন্যাসী এসে মার্গারেটের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা করে গেলেন। মার্গারেট অভিভূত। অনেকটা স্বপ্নের মত মনে হতে লাগলো। কলকাতায় তখন ঘোড়ায় টানা গাড়ী প্রধান যান বাহন। সেই গাড়ীতে চেপে শহরের রাস্তায় তাঁরা এসে গেলেন।

গাড়ী গিয়ে থামলো পার্কস্ট্রীটের এক বাড়ীতে। এই বাড়ীতেই মার্গারেট রইলেন কিছুদিন।

আসার পর দিন থেকেই কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে শুরু হল বাংলা ভাষা শেখা। স্বামীজী একজন ব্রহ্মচারীকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি রোজ এসে বাংলা শেখাতেন।

মিসেস্ সারা বুল, মিস ম্যাকলয়েড তখন বেলুড়ে এসে বাস করছিলেন। বেলুড়ে কাজ শুরু হয়েছে মঠ প্রতিষ্ঠার। মিসেস বুল অঢেল অর্থ সম্পত্তির মালিক ছিলেন। স্বামীজী তাঁকে ডাকতেন 'ধীরা মাতা' নামে। ওঁদের দুজনের সঙ্গে মার্গারেটের থাকার ব্যবস্থা হল।

সাগর পেরিয়ে স্ব সমাজের বন্ধন এড়িয়ে মার্গারেট ভারতবর্ষে এসেছেন। ভারতের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে রেখেছেন। মার্গারেট বিদেশিনী। বিশেষ করে ইংরেজ। এদেশের জনসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়া দরকার। যাদের জন্যে তিনি উৎসর্গিত হয়ে এসেছেন তাঁরা এই মহীয়সীকে চিনে নিক। তাঁর ক্ষমতার— তাঁর বৈদগ্ধের পরিচয় জনসমক্ষে প্রচারিত হোক। বিবেকানন্দের এই ছিল ইচ্ছে। কেননা মার্গারেটের ঐশ্বর্য তার স্বপ্রকাশিত আলোয় একদিন আপন তেজে দ্যুতিমান হয়ে উঠবে। চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়ে ঝরে পড়বে তাঁর চিত্তের অশেষ সম্পদ—একথা স্বামীজি দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝে নিয়েছিলেন। কোন এক শুভ সূচনার মধ্যে দিয়ে এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা লোককে জানাতে হবে। স্বামীজি এক পরিকল্পনা করে নিলেন। তাই মার্গারেটের আগমনের দেড়মাসের মধ্যেই এক জনসভার আয়োজন করা হল। বিদুষী মার্গারেটের পরিচয় সেইদিনই ভারতের জনসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত হবে।

১১ই মার্চ স্টার থিয়েটারে সেই সভা। লোকে লোকারণ্য। স্বামীজি স্বয়ং সভাপতির আসনে বসে। মার্গারেটের বক্তৃতার বিষয়

ছিল—'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব।' সেদিন মার্গারেটের বাগ্মিতায় উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন,...'আমার বিশ্বাস বাগ্মিতায় সে শীঘ্রই মিসেস বেশান্তকে ছাড়িয়ে যাবে..." স্বামীজির ভবিষ্যৎবাণীর সমস্তটাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল।

এর কিছুদিন পরেই মার্গারেটের জীবনে এল আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিন। মার্গারেটের সঙ্গে সেদিন সারদা দেবীর সাক্ষাৎ হলো। শ্রীমার সঙ্গে প্রথম দর্শনের দিনে সঙ্গী ছিলেন মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলয়েড। শ্রীমা সেদিন এই তিনজন বিদেশিনীকেই পরম স্নেহে অভ্যর্থনা করেছিলেন। একেবারে আপনার জনের মত ব্যবহার করেছিলেন। এদের সঙ্গে একাসনে বসে আহার করেছিলেন। অপরিচিত এই বিদেশী মেয়েদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা ঠিক মায়ের মতই হয়েছিল—মা যেমন মেয়েদের সঙ্গে আচরণ করে থাকেন।

সারদা দেবীর কাছ থেকে ফেরার সময়ে স্বামীজি মার্গারেটকে জানিয়ে দিলেন আর কয়েকদিন বাদেই তাঁকে দীক্ষা দেওয়া হবে। মার্গারেট বাড়ী এসে শ্রীমার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা লিখে রাখলেন। স্মরণীয় দিনটির উল্লেখে লিখলেন—"ডে অব ডেজ"—সবার সেরা দিন।

এর পরের ঘটনা মার্গারেটের দীক্ষা গ্রহণ। ১৬ই মার্চ ১৮৯৮। মার্গারেটের জীবনের সবচেয়ে পরমাশ্চর্য দিন। কলকাতায় আসার মাস দুয়েকের মধ্যেই এই ঘটনা। দেবতার পায়ে জীবনকে নিবেদন করার পরেই আসবে সেই অধিকার, যে অধিকারে নিষ্কাম জীবনের আকুলতা নিজের স্বার্থের গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্বজগতের প্রয়োজনে নিবেদিত হয়ে জীবন চরিতার্থ হয়ে উঠবে।

স্বামীজি সেদিন শৈব যোগিদের সাজে অপরূপ মূর্ত্তি ধরেছেন। ছাই মাথা দেহ, মাথায় পরচুলের জটা। তার রাশিকৃত চুল হাঁটু অবধি লুটিয়ে পড়েছে। কানে কুণ্ডল। গলায় ছোট বড় রুদ্রাক্ষের মালা। দীক্ষা গ্রহণের শেষে গুরুর দেওয়া ভস্মতিলক কপালে নিয়ে গুরুকে প্রণাম করলেন মার্গারেট। তিনি তাঁর নতুন নামকরণ করলেন।

স্বামীজি নাম দিলেন 'নিবেদিতা'।

নিবেদিতা মাথা তুলে দেখলেন সামনে জ্বলন্ত হোমশিখা। তার ইতস্তত চঞ্চল নৃত্যে আর আলোর ছটায় নিবেদিতা চিনে নিলেন তাঁর আগামী জীবনের স্বরূপ। ঐ শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তাঁর সমস্ত অতীত। শিখায় যে দীপ্তি তার আভায় দীপ্তিময়ী হয়ে তাঁকে আলোক বিকীরণ করতে হবে। নতুন জীবনের চঞ্চল নৃত্যে হোমশিখার মত প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে নিবেদিতার জীবন। নিবেদিতা প্রাণ ভরে শুনলেন সেই আদিম মন্ত্র। একজন সন্ন্যাসী পাশে বসে অবিশ্রান্ত ভাবে গান করে চলেছেন :

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জোর্তিগময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়
রুদ্রযত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্‌॥

স্বামীজি সেদিন নিজেও অন্যরূপ ধরেছিলেন। অন্য এক ভাব—মূর্ত্তি। একদিন তিনি ডাক দিয়ে বলেছিলেন "ভারতবর্ষের হাজার হাজার মেয়ে প্রতীক্ষা করে আছে পশ্চিমের একটি মেয়ে যদি পাশে দাঁড়িয়ে তাদের পথ দেখিয়ে দেয়...।" আজ তিনি সেই মহীয়সী নারীকেই মহত্তম কাজের দীক্ষা দিলেন। তাঁর অন্তরের উল্লাস সেদিন সঙ্গীতের আকারে উৎসারিত হয়েছিল। তানপুরা নিয়ে স্বামীজি গান গাইতে বসলেন।

'পর্বত পাথার ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত বাজ
দেবদেব মহাকাল,
ধর্মরাজ শংকর শিব তার হর পাপ।'

অবিশ্রান্ত ভাবে একটি ঘণ্টা তিনি গান গাইলেন।

ভারত-দেবতার পায়ে নিবেদিত হলেন মার্গারেট। এইবার চিনতে হবে ভারতবর্ষকে। ভারতের দীন দরিদ্র মানুষকে। জানতে হবে ভারতের ঐশ্বর্য, তার নতুন বৈভব। এই পরিচয় সম্পূর্ণ করে, এই জানা শেষ করে নিবেদিতার শুরু হবে কর্মযজ্ঞ।

স্বামীজি ঠিক করলেন নিবেদিতা ও অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে তিনি হিমালয় ভ্রমণে বেরুবেন। ভারতের মহত্তম পরিচয় তার হিমালয়ে। এই উত্তুঙ্গ শৈল শিখরের মহিমার মাঝে ভারতের দেবতাত্মা ভাস্বর হয়ে আছেন। হিমালয়ের প্রসাদ নিয়ে যে জীবন যাত্রার শুরু হবে তার স্থির প্রজ্ঞাদীপ্ত আভায় মনের অন্ধকার দূর হবে।

এই দেশ ভ্রমণের উল্লেখ করে নিবেদিতা নিজের অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। লিখেছেন,...."হিমালয়ের বুকে, নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, শেষে কাশ্মীরে নানাস্থানে বেড়াবার সময়ে এমন সব মুহূর্ত এসেছিল যা কখনো ভুলে যাবার নয়। এমন সব কথা শুনেছি যা আমাদের সারা জীবন ধরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। আর অন্তরের মাঝে জেগে থাকবে একবার মাত্র দেখা সেই চকিত দিব্য দর্শন।"

হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পরিবেশে প্রকৃতির অপরূপ খেয়ালের মধ্যে বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্বের তুলনা ছিল না। নিবেদিতা প্রাণ ভরে সেই বিরাট পুরুষের সঙ্গ লাভ করেছেন। স্থানকাল পাত্রের এই অপূর্ব যোগাযোগ মুহূর্তে নিবেদিতার চেতনা অতীন্দ্রীয় জগতের চকিত স্পর্শ লাভ করেছিল : 'এমন এক প্রেমের বিকাশ আমরা

দেখেছি যা ক্ষুদ্রতম আর অজ্ঞতমকে আলিংগন করেও এক হয়ে যায়—ক্ষুদ্র ও অজ্ঞের সঙ্গে নিজের কোনো বিভেদ রাখে না।'

তবু ভ্রমণ কালে নিবেদিতার এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। স্বামীজির আচার আচরণে, কথায় বার্তায় যে সুর, যে বক্তব্য থাকতো তা তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত ঠেকেছিল। ইংলণ্ডে প্রথম পরিচয়ের মুখে যে স্বামীজিকে তিনি দেখেছিলেন এখানে দেখলেন তার এক বিপরীত রূপ। নিবেদিতার ধ্যান ধারণায় তা মেলেনা। স্বামীজির সেই আচরণের মধ্যে আত্মবিস্মৃতি এত তীব্র হয়ে উঠতো তাতে নিবেদিতার নানারকম সংস্কারে আঘাত লাগতো।

নিজের জগত, পরিবেশ, এমন কি নিজেকেও বিলুপ্ত করে দিয়ে নিখুঁত উদাসীনভাবে কাজ করে যাওয়া বা চিন্তা করে যাওয়া নিবেদিতার বোধগম্য হত না। স্বামীজির সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সংঘর্ষ বেঁধে উঠতো। নিবেদিতা নিজের ব্যক্তি-স্বরূপ সচেতন ভাবে কোথাও হারিয়ে ফেলতেন না। নিজের বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় রাখতে গিয়ে স্বামিজীর তিরস্কার লাভ করতেন।

নিবেদিতার মনে জাগত তুমুল আলোড়ন। কখনো কখনো মানসিক বিক্ষোভও দেখা দিত। তাঁর মনের মধ্যে প্রচণ্ড তেজ ও অভিমানের কমতি ছিল না। বিবেকানন্দের মত বিরাট পুরুষের ব্যক্তিত্বের মাঝে অভিভূত হয়ে নিজেকে বিসর্জন দেবার মত অবস্থাও তাঁর ছিল না। তাই উত্তর জীবনে বিবেকানন্দ তাঁকে মনের মত কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সেই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ সুযোগ নিবেদিতা চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্র, অরবিন্দ, অবনীন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকের কর্মসাধনায় তিনি মূর্তিমতী প্রেরণা হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পর্কেও অনেকটা এই রকম ব্যাপার ঘটেছিল। বিবেকানন্দের ব্যক্তি স্বরূপ

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করতে পারেননি। নরেন্দ্রনাথের জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ পরিবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব কোন সম্প্রদায় বা ধর্মের বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়নি। কর্মের স্বাধীনতা, চিন্তায় স্বাধীনতা এমন কি ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে স্বামীজি ধর্মসাধনার সঙ্গে মানব-মংগলের আর্দশ এক করে নিয়ে লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

উত্তর ভারত ভ্রমণের সময়ে নিবেদিতার সংগেও স্বামিজীর যে সামান্য মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় উত্তর কালে তার ফলে নিবেদিতাই লাভবান হয়েছিলেন। স্বামীজির ওপর নির্ভর করে নিবেদিতা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু সামনে ছিল অত্যন্ত কঠোর আদর্শ। এখানে নেই নিজের পরিবার, পরিজন, পরিচিত পরিবেশ। সম্পূর্ণ অপরিচিত বিদেশে নতুন পরিচিত জনের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে আদর্শের প্রতি একাগ্রতা অটুট রেখে এগিয়ে যেতে হবে। তাই বিবেকানন্দের মধ্যে তিনি চেয়েছিলেন এক স্নেহপরায়ণ আচার্যকে—স্বামীজির ওপর ছিল তাঁর অসীম নির্ভরতা। কিন্তু স্বামীজি এই সময় থেকেই উদাসীন হয়ে পড়লেন। নিবেদিতার কোনো কোনো ব্যক্তিগত ভাবনা, ধ্যানধারণার অত্যন্ত কঠিন সমালোচনায় তিনি ইতস্তত করতেন না। স্বামীজির এই আচরণ নিবেদিতার কাছে উপেক্ষার মতই ঠেকতো।

অসহ্য মানসিক যন্ত্রনার মধ্যে নিবেদিতার দিন কেটেছে। কিন্তু নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব কোনদিনই খর্ব হয়নি।

স্বামীজি একদিন বললেন, 'যদিও বহু সময় আমি তোমাদের মনের মত কথা বলি না, বা আমার কথার মধ্যে রাগ প্রকাশ পায় তথাপি মনে রেখ, প্রেম ব্যতীত অন্য কিছু প্রচার করা আমার হৃদয়ের ভাব নয়। আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসি, শুধু এইটুকু হৃদয়ঙ্গম করলেই সকল বিবাদের অবসান হবে।'

সেইদিনই অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে নিবেদিতার মুক্তি হল। হৃদয়ের তীব্র জ্বালা নিয়ে এতদিন নিবেদিতার কঠিন পরীক্ষা চলছিল। স্বামীজির উপেক্ষার মধ্যে দুঃখের তীব্রতা যতই বাড়তে থাকে আত্ম উপলব্ধির সাধনায় নিবেদিতার সিদ্ধি ততই এগিয়ে আসে। গুরুর সঙ্গে মনোমালিন্যের অবসানে নিবেদিতা কঠিন পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সে পরীক্ষা হল, নিজের ব্যক্তিত্ব অক্ষুন্ন রেখে গুরুর কর্মে নিজেকে সম্পূর্ণ করা। চরিত্রের এই দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর অহমিকাশূন্য নম্রতার তুলনা মেলেনা।

চোখের জলে প্লাবিত হয়ে নিবেদিতার নবজন্ম হয়েছিল। কারুর ওপর নির্ভর না করে অবিচল নিষ্ঠায় আপন কর্মে রত হয়ে নিজের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে—এই শিক্ষা সেদিন তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। জীবনে একান্ত করে কোন কিছু চাওয়ার আশা, পাওয়ার সংকল্প মানুষকে দিশাহারা করে দিতে পারে। জীবনে কোন কিছু না পাওয়ার বেদনা থেকে উদাসীন হয়ে একাকী পথ চলার আনন্দের মধ্যেই জীবনের লক্ষ্য গড়ে তুলতে হবে। যেখানে পথ চলাতেই আনন্দ সেখানে সম্বল হবে গুরুর অভয়বাণী। বিবেকানন্দের এই শিক্ষাই নিবেদিতার যাত্রা পথের আশ্চর্য সম্পদ হয়ে রইলো।

বিলেতে বন্ধু নেল হ্যামণ্ডকে তিনি চিঠিতে লিখলেন—'এখনও আমি যেন সন্ধ্যার অন্ধকারে এদিক সেদিক পথ খুঁজে মরছি। একে তাকে জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি প্রমাণ চাইছি, জানি একদিন পথ খুঁজে চলা সার্থক হবে সত্যকে প্রত্যক্ষ করবো এই আশাই ধ্রুব। আমার সেই খুঁজে পাওয়া পথ আরো পাঁচজনকে বলে দিয়ে যাবো—।'

গুরুর সঙ্গে নিবেদিতা পাঁচমাস হিমালয়ের প্রান্তরে প্রান্তরে অক্লান্ত ভাবে ঘুরে বেড়ালেন, দেখলেন আলমোড়া, শ্রীনগর,

অমরনাথ, পহলগাঁও। ভারতের এক মহান রূপের সঙ্গে পরিচয় হলো।

উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ হল। এইবার নিবেদিতা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কাজের শুরু হওয়া দরকার। সমাজ কর্মে, রাজনীতিতে, শিক্ষা বিস্তারে নিবেদিতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে শিক্ষাবিস্তারের কাজেই নিবেদিতার আগ্রহ বেশি। তাছাড়া, ভারতবর্ষের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার মোটেই নেই। উপরন্তু রয়েছে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও নানারকম ভ্রান্ত বিশ্বাস। কোনো সমাজের উন্নতির পথে এ সবই বাধাস্বরূপ। স্বামীজির নিজেরও ইচ্ছে এদেশের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হোক। নিবেদিতাই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি যাঁর নেতৃত্বে আর পরিকল্পনায় মেয়েদের মধ্যে সত্যিকারের শিক্ষা প্রসারিত হবে।

বাগবাজারের এক বাড়ীতে সভার আয়োজন হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজির গৃহস্থভক্তদের সভা। নিবেদিতার নতুন স্কুল সম্পর্কে ঐ সভায় আলোচনা হল। পরিকল্পনা নিবেদিতা সভায় পেশ করেছিলেন। কিন্তু কারুর কাছ থেকেই বিশেষ সাহায্যের আশা পাচ্ছিলেন না। নিবেদিতার স্কুলে মেয়ে দেবার কথা ঘোষণা করতে কেউই ভরসা পান না।

নিবেদিতা জানতেন না কখন যে স্বামীজি চুপিসাড়ে এসে সভায় সকলের পেছনে আসন গ্রহণ করেছেন। নিবেদিতার বক্তৃতার পর সকলকে নিরুত্তর দেখে স্বামীজি পেছন থেকে কোনো কোনো জনকে ঠেলে উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

স্বামীজি বলছেন, "ওঠ্ নারে ওঠ্, খালি মেয়ের বাপ হলেই হয় না। জাতীয় ভাবে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। বল, হ্যাঁ। আমরা রাজি আছি। আমরা তোমাকে মেয়ে দেব।"

শেষ পর্যন্ত হরমোহনবাবুকে ঠেলে রাজী করিয়ে দিলেন।

নিবেদিতা প্রচুর উৎসাহ পেলেন। খুশীতে বিভোর হয়ে হাততালি দিয়ে উঠলেন।

বাগবাজারে বোস পাড়া লেনে বাড়ী নেওয়া হয়েছে। স্কুল হবে এখানেই। সেদিনটি ছিল ১৪ই নভেম্বর। স্কুল প্রতিষ্ঠার দিন। নিবেদিতার মন অধীর আগ্রহে ভরে আছে। ভারতবর্ষে এসে এই দিনেই তাঁর শুভকাজের সূচনা। এই কাজের মধ্যে দিয়েই নিবেদিতা ধীরে ধীরে তাঁর কর্ম জগৎ প্রসারিত করে দেবেন।

সেদিন গৃহের দ্বারে মংগল ঘট বসানো হয়েছে। আল্পনায় কল্যাণ চিহ্ন আঁকা হয়েছে। দরজার মাথায় মস্ত সাইন বোর্ড। লাল নীল কাগজের শিকলি দিয়ে সমস্ত বাড়ীটাই সাজানো। শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ ভক্তরা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন।

সারদা দেবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূজো নিজের হাতে করলেন।

স্বামীজি আশীর্বাদ দিলেন—"আমি প্রার্থনা করি—এই বিদ্যালয়ের ওপর যেন মহামায়ার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়—এখানকার মেয়েরা শিক্ষা পেয়ে যেন আদর্শ বালিকা হয়ে উঠে।"

স্কুল গড়ার পর নিবেদিতা নিজেকে মিশিয়ে দিলেন বাগবাজারের প্রতিবেশীদের সঙ্গে। বিনয়ে, সৌজন্যে, আন্তরিক ব্যবহারে নিবেদিতা আশে পাশের সকলের মন জয় করে নিলেন। তাঁর আচার আচরণে মনেই হত না যে তিনি একজন বিদেশী।

সব থেকে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল বাগবাজারের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সঙ্গে। নিবেদিতা তখন ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলতে শিখেছেন। বোস পাড়া লেনের বাড়ীতে আশ-পাশের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে নিবেদিতাকে ঘিরে ধরতো। নিবেদিতাও তাদের সঙ্গে ভাঙা বাংলায় কথা বলতেন। রং তুলি উপহার দিয়ে তাদের ছবি আঁকার কায়দা শিখিয়ে দিতেন।

মেয়েদের ভারী মজা লাগতো এমন একজন বড় সঙ্গী ধারে

কাছে কোথাও নেই যাঁর কাছে বকাঝকা নেই—যাঁর টকটকে ফরসা গায়ের রং—খালি আদর করে, পুতুল উপহার দেয়, ছবি দেয়—ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো সেলাই করতে শেখায়। দেখতে দেখতে ছোট ছোট ভাই বোনেদের সঙ্গে তাদের দিদিরা মায়েরাও আসতে শুরু করলেন।

তাঁদের সকলের সঙ্গেই নিবেদিতার আন্তরিক ব্যবহার। নিবেদিতা যে সকলের বোন। সকলের সিস্টার। সিস্টার নামেতেই সারা বাগবাজারে তিনি পরিচিতা হয়ে গেলেন। সিস্টার সকলের সঙ্গেই সুখ দুঃখের গল্প করেন। সংসারের প্রয়োজন অনুসন্ধান করে সাধ্যমত সাহায্যের চেষ্টা করেন। অনেকের বাড়ী গিয়েও খোঁজ খবর নিয়ে আসেন। মানুষের অসুখ বিসুখে পাশে এসে দাঁড়ান। আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হলে চোখের জলও ফেলেন। এমন মানুষকে আপনার জন করে নেওয়া ছাড়া উপায় কী?

কোন দূর দেশ থেকে, সাত সমুদ্রের ওপার থেকে এক বিদেশী বোন এসে আমাদের রোজকার সুখ দুঃখের ভাগ নিয়ে নিলেন।

সিসটার নিবেদিতার এই সময়কার আরেক রূপও আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সবে তখন নতুন বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। নতুন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা বেলুড়ে এসে বাস করছেন। স্বামীজির নির্দেশ, তাঁদের নানা বিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে। কেবল সাধন ভজন আর শাস্ত্র পাঠ ছাড়াও তাঁদের পৃথিবীর নানা জ্ঞান আহরণ করতে হবে। প্রাচীন পৃথিবীর তত্ত্ব ও আধুনিক পৃথিবীর পরিচয় নিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষের আচার্যের আসনে এসে বসবেন। সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের বিভিন্ন বিদ্যাদানের ব্যবস্থা হল বেলুড় মঠে। নিবেদিতা বিদুষী রমণী। শিক্ষিকা হিসেবেও তাঁর অপরিমেয় অভিজ্ঞতা রয়েছে। আধুনিক জ্ঞান সম্পদে রয়েছে পারদর্শিতা।

স্বামীজি নিবেদিতাকে সন্ন্যাসীদের শিক্ষাদানের জন্য নির্বাচিত করলেন। নিবেদিতা পাঠ দিতেন উদ্ভিদ বিদ্যা ও শারীর বিদ্যার। বাগবাজারে মা বোনেদের সঙ্গী, দুঃখ সুখের অংশ ভাগী নিবেদিতা বেলুড় মঠে অন্যতম পরিচালিকার সম্মান করায়ত্ত্ব করেছেন।

শুধু তাই নয়, এই সময়ে তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক সভায় বক্তৃতাও দিতে হত। সিস্টার নিবেদিতার নাম তখন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। বাগ্মীতায় তিনি তুলনাহীনা রূপে খ্যাতির অধিকারী। উত্তর ভারত ভ্রমণের পর এক নাগাড়ে মোটে আট মাস কাল নিবেদিতা বাংলা দেশে ছিলেন—এই মাত্র কয়েক মাসেই নিবেদিতা বাংলার শিক্ষিত জনের হৃদয় মন জয় করে নিলেন। বাংলার নব জাগরণের অন্যতম হোতা স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজির শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা স্বামীজির কর্মের, চিন্তার, প্রতিমূর্ত্তি হয়ে দেখা দিলেন।

বিদ্যার পরিচয়ে নিবেদিতা যখন শিক্ষিত মানুষদের শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ের পাত্রী হয়ে উঠেছেন দেশে এল তখন দুর্দিন। প্লেগের বিভীষিকা। সামাজিক কাজেও সিস্টার পেছপা নন। শিক্ষয়িত্রী আচার্য্যানী তখন বরাভয় হাতে জনসাধারণের সেবিকা হয়ে দেখা দিলেন। স্বামীজি সাহায্য সমিতি খুললেন। নিবেদিতা হলেন সম্পাদিকা। জনসাধারণের সেবা কার্যে নিবেদিতার অভিজ্ঞতাও কম ছিল না। ইংলণ্ডে রেক্সহ্যামের খনি অঞ্চলে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর মস্ত বড় সম্পদ। বাংলা দেশের পীড়িত মানুষদের সেবায় তিনি কর্ম-পরিচালিকার আসন সহজেই অধিকার করে নিলেন।

নিবেদিতা অদম্য উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। বাগবাজারের পাড়ায় পাড়ায় ছাত্রের দল যোগাড় করে তাঁদের কর্মে উদ্দীপনা এনে দিলেন। কয়েকজন সন্ন্যাসী আর ছাত্রদের নিয়ে নিজের হাতে

জঞ্জাল সাফ করেছেন তিনি। বাড়ী বাড়ী ঘুরে মুমূর্ষু রোগীদের সেবার কাজে লেগে গেলেন। অস্থায়ী চিকিৎসালয় খুলে ওষুধ আর টিকে দিয়ে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিখুঁত করে তুললেন। নিবেদিতার কাজে ছাত্রদের মধ্যে সেবাব্রতের অদ্ভুত প্রেরণা এল। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তুচ্ছ করে আত্মত্যাগের আদর্শে ছাত্র ও যুব সমাজ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। সমস্ত ক'লকাতা সবিস্ময়ে দেখলো একটি অসামান্য নারী মূর্তিমতী প্রেরণা হয়ে শহরকে রোগ মুক্তির নিশানা দিলেন।

এই কাজে অসম্ভব পরিশ্রম হয়ে ছিল নিবেদিতার। বিরাট ত্যাগের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিবেদিতা ক্লান্ত, শ্রান্ত। অমানুষিক খাটুনির পর নিবেদিতার বিশ্রাম একান্ত দরকার হয়ে পড়লো। শহর তখন রোগ মুক্তির পথে। তবু স্বামীজির পায়ের তলায় বসে নিবেদিতা একটা প্রার্থনা জানালেন, 'স্বামীজি' আমায় ব্রতের শেষ দীক্ষা দিন।'

স্বামীজি সায় দিলেন। বললেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। পরের দিন ২৫শে মার্চ। ঠিক একটি বছর পার হয়ে গেছে তাঁর প্রথম দীক্ষার পর।

২৫শে মার্চ, ১৮৯৯। নিবেদিতা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর সম্মানে ভূষিতা হলেন। রামকৃষ্ণ সংঘে প্রবেশের অধিকার অর্জন করলেন।

এইবারে নিবেদিতার স্কুলের কথা বলি। কত সামান্য উপকরণ নিয়েই না এর শুরু হয়েছিল। মোটে তিনটে মেয়ে নিয়ে এর যাত্রারম্ভ।

পড়ুয়া হিসেবে ঐ তিনজনকে ছাড়া আর কাউকেই সেদিন পাওয়া গেল না।

তিনজনকে নিয়ে যার শুরু তার উপর নিবেদিতার মমতার

শেষ নেই। ভারতের সর্বত্র এমন কি বিদেশে ইংলণ্ডেও এই স্কুলের কাহিনী তিনি প্রচারিত করে দেবেন। এখান থেকেই গড়ে উঠবে ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ মহিমা। এই বিশ্বাসে অবিচল নিষ্ঠা রেখে নিবেদিতা স্কুলের কাজে মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন।

মনোযোগ দিয়ে তিনি বাচ্চা মেয়েদের ধরণ ধারণ দেখতেন। দেখলেন, এখানকার মেয়েদের মনের বিকাশ হয় সম্পূর্ণ আলাদা ধরণে। এরা মাটির পুতুল গড়ে তাকে দেবতা বানিয়ে পূজো করতে বসে। মাটির খেলনা নিয়ে ঘরগড়ার খেলায় মেতে ওঠে। যে মাটির পুতুলকে দেবতা বানায় তাকেই আবার সন্তানের স্নেহে মানুষ করার অভিনয় করে। গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়, খাওয়ায়, বকাঝকা করে। বাচ্চা মেয়েদের এই রূপ নিবেদিতার কাছে সম্পূর্ণ নতুন ঠেকলো। পশ্চিমের মেয়েদের ধরণ ধারণের সংগে মেলেনা।

শিশুদের শিক্ষা দিতে গিয়ে নিবেদিতা নিজেই তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে বসেন। এই শিক্ষার মধ্যে ভারতীয় নারীর স্নেহ মমতার পরিচয় রয়েছে। নিবেদিতা দেখলেন একেবারে বাচ্চা বয়স থেকেই এদেশে মেয়েদের মনে সুপ্ত হয়ে থাকে বোন হয়ে ভাইকে সেবা করার বাসনা, মা হয়ে সন্তানকে প্রতিপালন করার ইচ্ছে। নিবেদিতা চাইলেন মেয়েদের অস্ফুট ইচ্ছাকেই ঘসে মেজে নিখুঁত করে তুলতে হবে যাতে বয়সের সংগে সংগেই তারা আদর্শ বোন, আদর্শ মা, আদর্শ সঙ্গিনী হয়েই সমাজের মংগলময়ী শক্তির আধার হয়ে উঠতে পারে।

স্বামীজিও বললেন, 'শিক্ষার আদর্শ হবে উদার।......সবকিছুর উদ্দেশ্য হল এই আদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করা, যে আদর্শ ঘোষণা করে মানুষের সেবা কর, রুগ্নের পরিচর্যা করা, নিরন্নকে অন্ন দাও। এমনি করে হাতে কলমে শিক্ষা দানের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের পরিধি আর কর্মের সীমান্ত দিগন্ত স্পর্শ করবে।'

নিবেদিতার এই স্কুল একদিন দেখতে এলেন সুরেন্দ্রনাথ। ঠাকুর পরিবারের সন্তান, রবীন্দ্রনাথের ভাইপো। ব্রাহ্মসমাজের আমন্ত্রণ পেয়ে নিবেদিতা যে সব ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে সমাজের অনেকেই বিশেষ করে ঠাকুর পরিবারের লোকেরা নিবেদিতার গুণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বন্ধুত্ব সূত্রে বাঁধা পড়েছিলেন। বিশেষ ভাবেই অনুরক্ত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন ছাব্বিশ। তরুণ মনে তাঁর তখন অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মনে মনে মাতৃভূমির স্বাধীনতার কামনা দীপ্তিমান হয়ে আছে। নিবেদিতার সংস্পর্শে এসে তিনি আরো উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন, ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তিনি হন যোগাযোগের সেতু।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে নিবেদিতার আগ্রহ হয়। অমন পরম পুরুষ, যাঁকে ঘিরে রয়েছে জীবনের অপরূপ শান্তি, স্নিগ্ধতার যিনি প্রতিমূর্তি, পরম সত্যের উপাসক তাঁকে দর্শন করা বহু ভাগ্যের কথা। প্রথম যৌবনে বিবেকানন্দ দেবেন্দ্রনাথের কাছে একবার সংশয় কাতর প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ভগবানকে দর্শন করেছেন কিনা, অদ্বৈতবাদ বুঝিয়ে দিতে পারেন কিনা—এমন সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন যুবক নরেন্দ্রনাথের মুখ থেকে বেরিয়েছিল। মহর্ষির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নের জাল তুলে ধরতে নরেন্দ্রনাথের একটুও দ্বিধা হয়নি। সাধ্যমত জবাবও দিয়েছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তারমধ্যে একটুও কারচুপি ছিলেনা।

মহর্ষি জবাব দিলেন, 'তুমি সাধনা কর, এর উত্তর নিশ্চয়ই পাবে'।

নিজের দর্শনের কথা, অভিজ্ঞতার কথা সাড়ম্বরে বলে নিজের অহংকে পরিতৃপ্ত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিলনা। নরেন্দ্রনাথ একদিন সত্যি সত্যিই পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই মহর্ষির ওপর

তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। যেদিন শুনলেন নিবেদিতা যাবেন মহর্ষিকে দেখতে সেদিন নিবেদিতাকে আশীর্বাদও পাঠালেন।

নিবেদিতা মুগ্ধ হয়ে সেই বৃদ্ধের রূপ দেখলেন। দেখলেন তাঁকে ঘিরে রয়েছে জ্যোতির এক পরিমণ্ডল। অতুল শান্তিময় পরিবেশ। অভিভূত হয়ে প্রণাম জানালেন। বললেন, তিনি বিবেকানন্দের শিষ্যা। মহর্ষি খুশী হয়ে বললেন, 'বিবেকান্দের বালক বয়সে একবার তাকে দেখেছিলাম। আমি তখন গঙ্গার বুকে বজরায় বাস করছি। আরেকবার তাকে দেখতে ইচ্ছে করে।'

নিবেদিতা ফিরে এসে স্বামীজিকে মহর্ষির আকাঙ্ক্ষার কথা জানালেন। বিবেকানন্দ আকুল হয়ে উঠলেন এই আহ্বান পেয়ে। শিষ্যাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন ঠাকুর বাড়ী।

নিবেদিতা সেদিনের বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ঠাকুর বাড়ির দুই সন্তান। স্বামীজি এগিয়ে গিয়ে পরম শ্রদ্ধায় প্রণাম জানালেন। নিবেদিতা দুটো গোলাপ ফুল পায়ের কাছে রাখলেন।

তিনি খুব খুশী হয়ে স্বামীজির কার্যকলাপের প্রশংসা করলেন। বললেন, আগাগোড়া তিনি স্বামীজির কাজকর্মের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

এই পরম জ্ঞানবান বৃদ্ধের মুখে নিজের প্রশংসা বাণী শুনে বিবেকানন্দ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন। তাঁদের ঘিরে রয়েছেন ঠাকুর বাড়ীর আর সমস্ত সন্তানেরা। প্রায় দশমিনিট কাল ধীরে ধীরে মহর্ষি স্বামীজিকে তাঁর কাজের জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারপর চুপ করে রইলেন। এই পরিবেশ—প্রশংসার পরিমণ্ডলে স্বামীজি ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লেন। তিনি আস্তে আস্তে মহর্ষির আশীর্বাদ কামনা করলেন।

স্বামীজি উঠতে চাইলেন। কিন্তু ঠাকুর বাড়ির সকলে তাঁকে

ছাড়লেন না। চা খাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। সকলেই স্বামীজি ও নিবেদিতাকে ঘিরে ধরলেন। স্বামীজি চা খেলেন না। ধূমপান করলেন।

স্বামীজি প্রসংগক্রমে রামমোহনের কথা তুললেন। বললেন, তিনি নবভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। ফিরে আসার সময়ে স্বামীজিও তাঁদের বেলুড়ে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন।

একদিন সরলা দেবী আর সুরেন্দ্রনাথ বেড়াতে এলেন বেলুড় মঠে। ঘুরে ঘুরে তাঁরা বেলুড়ের সব কিছু দেখলেন। বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, আর নিবেদিতা রইলেন সংগে। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের মন্দিরে গেলেন, তারপরে নদী পার হয়ে দক্ষিনেশ্বর গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কালী মন্দির। তাঁরা কালী মন্দিরে গেলেন কিন্তু সরলা আর সুরেন্দ্রনাথের কোনো মূর্তি দেখার ব্যাপারে উৎসাহ নেই। তারা দেখে মন্দিরের স্থাপত্য, বাগান, গঙ্গার তীর। এতেই তারা খুশী।

স্বামীজির সংগে সরলার কথা হল অনেক। স্বামীজি বললেন, সরলা ভবিষ্যতে অনেক বড় কাজ করতে পারবে। নিবেদিতা ভাবলেন, হয়তো স্বামীজির সংস্পর্শে এসে ওদের ধর্মমত ঘুরেও যেতে পারে। নিবেদিতার আশা ছিল ব্রাহ্ম সমাজ আর রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে একটা যোগাযোগ গড়ে উঠবে। ব্রাহ্ম সমাজেও তখন দেশের অনেক বড় বড় লোক। তাদের জনবল অর্থবল দুই-ই আছে। রামকৃষ্ণ মিশন আর ব্রাহ্মসমাজের মিলনে দেশে যে আন্দোলন গড়ে উঠবে তার ফল হবে সুদূর প্রসারী।

দিন দুই বাদে সরলা দেবী চিঠি লিখলেন। তিনি স্বামীজিকে তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। চিঠিতে বলেছেন, তাঁরা বিবেকানন্দের জনসেবা আর আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করেন, কিন্তু স্বামীজি যদি সাকার দেবতার পূজো ত্যাগ করেন তবেই তাঁরা স্বামীজির সঙ্গে কাজে যোগ দেবেন।

নিবেদিতা এই ধরণের চিঠি আশা করেন নি। স্বামীজি নিবেদিতাকে বললেন, জগতে যারা কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে আসে তাদের মনে যেন কোন প্রত্যাশা না থাকে যে দুনিয়ার সব মানুষ তাদের কথা শুনবে।

কিন্তু কোনো গোড়ামী নিবেদিতার মনে কোনদিন ছিল না ভিন্ন সমাজের লোক বলে তিনি কাউকেও ঘৃণা করতে পারেন না। প্রতিভার আদর তাঁর কাছে সব সময়েই ছিল ব্রাহ্মসমাজের লোক হলেও জগদীশচন্দ্রের প্রতিভায় তিনি আকৃষ্ট।

জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণায় অপরূপ তত্ত্বের আভাস পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন সমস্ত পৃথিবী চৈতন্যময়। জড়ের মাঝেও প্রাণ। গাছপালা পাথর সকলের মধ্যেই এক অভূতপূর্ব ঐক্যের সমাবেশ আছে। ল্যাবোরেটরীর যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি গাছপালার প্রাণময় সত্তার প্রমাণ দিলেন। ধর্মের কোনা তর্কাতর্কিতে তিনি জগদীশচন্দ্রকে টেনে আনলেন না কেবল তাঁর উপলব্ধির সারকথায় নিবেদিতার আকর্ষণ। তিনি দেখলেন জগদীশচন্দ্র জগতের এক পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন। এই সত্য তাঁর মনের উপলব্ধি আর চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আপন প্রতিভার প্রেরণায় সাধারণ মানুষের কাছে তিনি তাঁর প্রমাণ হাজির করেছেন। বিবেকানন্দ জগদীশ-চন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন।

নিবেদিতা দেখলেন জগদীশচন্দ্রের নানান সাহায্যের প্রয়োজন। যেখানে দেশের সরকার কোন রকম সাহায্য করায় পরান্মুখ—দেশের লোকও প্রায় উদাসীন নিবেদিতা তখন সর্বাঙ্গীন সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন। অর্থ সাহায্যের জন্যে মিসেস বুলকে লিখলেন। ঠিক যেমনটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজকে। নিবেদিতা মিসেস বুলকে লিখেছিলেন, স্বামীজিকে যেমন তুমি সন্তান বলে মনে কর এঁকেও তেমন চোখে দেখো।

সাহায্য পেলে জগদীশচন্দ্রও য়ুরোপীয়নদের মত বিজ্ঞানের কাজে অসাধারণ সাফল্যলাভ করতে পারেন।

নিবেদিতার অনুরোধে মিসেস বুলও জগদীশচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের সারা জীবন ব্যাপী অতুলনীয় সখ্যতা গঁড়ে উঠেছিল। নিবেদিতা ছিলেন জগদীশচন্দ্রের কাজে মূর্তিমতী প্রেরণা। নিবেদিতার সহযোগিতার ঋণ জগদীশচন্দ্র কোনদিনও ভোলেন নি। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রবেশ মুখে তিনি আলোক-বর্তিকা হাতে এক মহীয়সী রমনীর মূর্তি খোদাই করে রেখেছেন। এই মূর্তি নিবেদিতার। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর জ্ঞানের আলো, চিত্তের আলো বিশ্বজনের কল্যাণে বিকীর্ণ করে দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ মহাকালীর সাধক। তাঁরা হৃদয়ের অভ্যন্তরে নিখিল বিশ্বের ধাত্রী হিসেবে মহাকালীর অস্তিত্ব অনুভব করেন। শক্তির উপাসনায় মাতৃমূর্তির অনন্য কল্পনা তাঁদের চিত্তকে পরম উপলব্ধির গভীরতায় টেনে আনে। এই উপলব্ধি নিবেদিতাও অনুভব করেন। ব্রাহ্মসমাজের সংগে যোগাযোগের শুরুতে যখন ধর্মোপলব্ধির ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কের শুরু সেই সময়ে স্বামীজি নিবেদিতার মণীষাকে কাজে লাগালেন। তিনি দেখলেন নিবেদিতাই হলেন যোগ্য সাধিকা যাঁর আবাহনে, বিশ্লেষণ মন্ত্রে মহাকালীর রূপ বর্ণনা সার্থক হয়ে উঠবে।

স্বামীজি নিবেদিতাকে বললেন, এবার তোমায় মহাকালীর সম্পর্কে ভাষণ দিতে হবে, যেমন তাঁকে বুঝেছ ঠিক তেমনটি তাঁর রূপের বর্ণনা, গুণের বর্ণনা দিতে হবে।

হিন্দু ধর্মে দীক্ষা হলেও নিবেদিতার কাছে এ এক কঠিন পরীক্ষা। তাঁর উপলব্ধি হিন্দু জনসাধারনের জন্ম জন্মান্তরের

উপলব্ধির সঙ্গে কী করে মিলবে? গুরু বলেছিলেন, নিজেকে মায়ের কাছে সঁপে দাও। স্বামীজি তাঁকে মা কালীর সম্মুখে এনেছেন। কিন্তু সেই সাধনার অধিকার দেন নি যার বলে তিনি মাতৃমূর্তি পূজোর অধিকারী হন। কিন্তু নিবেদিতা অসাধারণ প্রজ্ঞাময়ী রমণী। তিনি সনাতন ধর্মকে দেহ ও মনের সঙ্গে একান্ত করে নিয়েছেন। বলা যায়, জন্মজন্মান্তরের তরী বেয়ে যে জ্ঞান সনাতন বাদী হিন্দুর জীবন-প্রত্যয়ে পরিণত হয় নিবেদিতা সেই জ্ঞান গুরু মারফৎ অর্জন করেছেন। সেই জ্ঞান আহরণে কোনো ফাঁকি ছিলনা। নিবেদিতা তার প্রমান দিলেন অ্যালবার্ট হলে তাঁর ভাষণের মধ্যে দিয়ে।

ব্রাহ্মবন্ধুরাও নিবেদিতার ভাষণের প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যামত কালীর স্বরূপকে তাঁরা স্বীকার করেন না। চিন্ময়ী শক্তির মৃন্ময়ী রূপ তাঁদের গ্রাহ্য নয়। কিন্তু নিবেদিতার এই ভাষণ তখনকার কলকাতার ধর্ম জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লোকের মুখে মুখে নিবেদিতার বাগ্মিতার কথা, ধর্মোপলব্ধির কথা ছড়িয়ে পড়লো। ভক্তজনের কাছে এই বিদেশী নারী ধর্ম-উপদেষ্টার আসন পেয়ে গেলেন।

এমন সময়ে এল কালীঘাট থেকে আমন্ত্রণ। কালীঘাটের প্রধান পুরোহিত নিবেদিতার কাছে এসে কালীঘাটের মন্দির প্রাংগণে মহাকালী সম্পর্কে আরো কিছু বলার জন্যে অনুরোধ জানালেন। এই আমন্ত্রণে সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছেন স্বামীজি। নিবেদিতার এই রূপ, এই সাধনা, এই উপলব্ধির জন্মদান করেছেন স্বামীজি। আর নিবেদিতা যখন জনতার সামনে তাঁর সাধনার সত্যকে উদ্ঘাটিত করে তুলে ধরেন স্বামীজি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান।

স্বামীজি এসে বলেন, 'মার্গারেট, কালীঘাটের পুরোহিতেরা তোমার বক্তৃতা সভায় আমায় সভাপতি হতে বলেছে—কিন্তু

আমাকে দিয়ে তা হবে না—আমি সামলাতে পারবো না আমার আবেগকে।'

শিষ্যার ক্ষমতার ওপর গুরুর অসীম নির্ভরতা। তিনি জানেন মায়ের স্বরূপ বর্ণনা মায়ের কন্যাই চমৎকার ফুটিয়ে তুলতে পারবে। নিবেদিতাকে তিনি যাবার আগে আশীর্বাদ করে গেলেন।

নিবেদিতা খালি পায়ে মহাকালীর মন্দিরে এসে পৌঁছোলেন। ভক্তজন ও শ্রোতারা আগে থেকেই এসে উপস্থিত। আরেকবার তারা শুনতে চায় এই বিদুষীর মুখে তাঁর প্রত্যয়ের কথা। নিবেদিতা সেদিন মহাকালীকে বীর্যের আধার রূপে বর্ণন করলেন, আনন্দময়ী মাতৃমূর্তি রূপে ব্যাখ্যা করলেন, জগৎ ও জীবনের ছন্দময় অভিব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করলেন।

নিবেদিতা বললেন, তিনি মায়ের নিত্য দাসী।

এবারে সময় এল বিদেশ যাত্রার। স্বামীজি আবার দূরদেশে পাড়ি দেবেন। অর্থের সন্ধানে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাত্রা করলেন। সঙ্গে রইলেন নিবেদিতা আর স্বামী তুরিয়ানন্দ।

আমেরিকা থেকে মিস ম্যাকলয়েড লিখে পাঠিয়েছেন—স্বামীজি যুক্তরাষ্ট্রে চলে এলে তিনি টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। টাকা না হলে নিবেদিতার স্কুল চলবে না। মঠের খরচপত্রও চলবে না। মিশনের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ দুরবস্থার সম্মুখীন। মঠের যা সঞ্চয় ছিল সব শেষ হয়ে গেছে।

লণ্ডনে এসে নিবেদিতা স্বামীজিকে তুললেন তাঁর মা মেরী নোবলের আশ্রয়ে। মেরী নোবল সানন্দে মেয়ে আর তার গুরুকে বরণ করে নিলেন। কাছাকাছি বাড়ী ভাড়া নিয়ে তাঁদের যথাযথ স্বাচ্ছন্দে রাখার ব্যবস্থা করলেন। স্বামীজির বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। মেরী নোবলের আদরে, যত্নে, সেবায় স্বামীজির বিশ্রামে কোন ফাঁক রইলো না।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। যেন কত যুগ বাদে তিনি ফিরে এসেছেন আত্মীয় পরিজনের মধ্যে। যেন ছেলেবেলার সেই দিনগুলির মুখোমুখি তিনি দাঁড়িয়েছেন। মায়ের সদাসর্তক শাসন আর স্নিগ্ধ মমতা। ছোটবোন মে-র গলা জড়িয়ে ধরে হাসি ঠাট্টার কথা বলা। ছোট ভাই রিচমণ্ডের আবদারের কথা শোনা। মার্গারেট ফিরে এসেছে—বাড়ীতে তাই আনন্দের বান উপচে উঠেছে।

বিকেল বেলায় বাগানে গাছের তলায় নিবেদিতার ভাই, বোন, মা আর অন্যান্য পরিজন বন্ধুরা সবাই জড়ো হতেন। তাঁরা শুনতেন নিবেদিতার সাধের ভারতভূমির কথা। তাঁর ছেলেবেলার গল্প বলার ভঙ্গিটি ফিরে আসতো। ভারতভূমির গ্রামের কথা, চাষের কথা, মানুষ জনের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতেন। বলতেন মন্দিরে সন্ধ্যারতির কথা, দেবতার কথা। এ বলায় তার কোন ক্লান্তি ছিল না, শ্রান্তি ছিল না। বলার কথার শেষও ছিল না। মনের তলায় জমেছে অজস্র কথায় ভীড়। সবটাই নিবেদিতা উজাড় করে দেন।

ছোট ভাই রিচমণ্ড বিকেলবেলায় স্বামীজিকে নিয়ে বের হয়। শহরের পথে পথে ঘোরে। স্বামীজি তাকে চুম্বকের মত টেনে রেখেছেন। রিচমণ্ড মুগ্ধ হয়ে স্বামীজির ধর্মের কথা শোনে, উপলব্ধির কথা শোনে, স্বামীজির ঘনিষ্ঠতায় আর আন্তরিকতায় রিচমণ্ড অভিভূত হয়ে যায়। দেখে, এই বিরাট পুরুষের মনের গহন কোণে লুকিয়ে রয়েছে এক মস্ত ছেলেমানুষ।

কিন্তু বেশীদিন লণ্ডনে থাকা গেল না। স্বামীজি বেরিয়েছেন অর্থের সন্ধানে। যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে ভাষণ পিছু অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে। স্বামীজি নিউইয়র্কে আগেই চলে গেলেন। পরে গেলেন নিবেদিতা, ছোট বোনটি মে'র বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর। মে'র বিয়ের দিনে নিবেদিতা

অপরূপ সাজে দেখা দিয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে মিস ম্যাকলয়েড বোনের বিয়ে উপলক্ষে নিবেদিতাকে অদ্ভুত সুন্দর এক পোষাক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সাদা আলপাকার পোষাক আর ওড়না। বৈরাগ্যের আলোয় নিবেদিতার স্বাভাবিক রূপ-কান্তির তুলনা ছিল না। সেদিন সেই পোষাকে নিবেদিতার লাবণ্য শতধারায় ঝরে পড়েছিল।

নিউইয়র্কে স্বামীজি উঠেছিলেন মিসেস লেগেটের বাড়ীতে। তাঁর বাড়িতে গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ হতো, কবি শিল্পী, বিদ্বান ব্যক্তিদের আসর বসতো তাঁকে ঘিরে। এই আবহাওয়ায় স্বামীজি পরম সমাদরে রয়ে গেলেন। নিবেদিতা এসে উঠলেন এই একই ডেরায়।

কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে এবারে কাজ আরম্ভ করার সময় এল। আমেরিকায় স্বামিজীর শিষ্য শিষ্যারা সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বিভিন্ন সভায় স্বামীজি বক্তৃতা দেবেন। কোথাও নিবেদিতা দেবেন। ভারতসম্পর্কে আমেরিকার মানুষদের কৌতূহলের শেষ নেই। সব সভাতেই অর্থপ্রাপ্তি যোগ ছিল। আর স্বামীজির কথায় ছিল অপরূপ মোহ। যে শুনবে তাকে সবটা না শোনা পর্যন্ত আটকে থাকতে হবে। একবার শুনলে আরেকবারও শুনতে হবে। এমন ক্ষেত্র পেয়ে স্বামীজির উৎসাহের শেষ ছিল না। বক্তা হিসাবে নানান জায়গা থেকে স্বামীজির ডাক আসতো। ভারতের ধর্ম, গীতা, বুদ্ধের বাণী, যিশু ও বুদ্ধের তুলনা, এই সব নিয়ে স্বামীজি অজস্র বক্তৃতা দিতেন।

এদিকে নিবেদিতাও পেছপা ছিলেন না। তিনি বড়দের সভায় যেমন যেতেন, ছোটদের সভায়ও যেতেন। ছোটদের স্কুলে যেতেন। ছোটদের সভায় বলতেন ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শ্রীকৃষ্ণের ছেলেবেলার গল্প। বড়দের সভায় বলতেন ভারতের শিল্পকলা,

মেয়েদের অবস্থা—ভারতের মানুষদের প্রতিদিনের জীবন কাহিনী। নিবেদিতার ক্লান্তি ছিল না। শ্রান্তি ছিল না। তিনি পরিশ্রম করে যেতে লাগলেন তার তুলনাও নেই। ভারতের সম্পর্কে জানার আগ্রহ যখন আমেরিকার মানুষদের রয়েছে তিনি তার সব সুযোগটুকু নিয়ে নিলেন। অর্থের অভাব হতনা। সব সভা থেকেই টাকা আসতো। তা ছাড়া জুটে গেল একদল হিতৈষী বন্ধু। যাঁরা কিছু কিছু করে আজীবন সাহায্য করে যাবেন এমন কথাও বলতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে, নিবেদিতার স্কুলের কাজে সাহায্য তোলার জন্যে সমিতিও তৈরী হল। এঁরা আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে দান সংগ্রহ করে ভারতবর্ষে পাঠাবেন।

নিবেদিতা শহরের পর শহর ঘুরেছেন। কিন্তু সব জায়গা থেকেই যে প্রত্যাশা মতন সাহায্য পেয়েছেন তা নয়। কোথাও কোথাও নিরাশ হতে হয়েছে আর কোনো কোনো সভায় তাঁকে কটূক্তি শুনতে হয়েছে। বিদ্রূপ শুনতে হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষের পরাধীনতার কথা, গ্লানির কথা শুনতে হয়েছে। এই সব সভা থেকে ফিরে এসে মনে হত তিনি বুঝি ব্যর্থতায় ভেঙ্গে পড়বেন কিন্তু কোন রকম নিরাশা আর ব্যর্থতার বেদনা তাঁকে দমিয়ে দিতে পারেনি। স্বামীজির আশীর্বাদ আর প্রেরণা রয়েছে তাঁর সব কাজের পেছনে। আর রয়েছে ভারতভূমির আহ্বান। এই আহ্বানের জাদুতে তিনি ঘর ছেড়েছেন, দেশ ছেড়েছেন, আত্মীয় পরিজন, মা, ভাই, বোন সকলের দুর্নিবার আকর্ষণ কাটিয়ে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন ভারতভূমির কল্যাণে।

ঝড়ের বেগে ঘুরেছেন নিবেদিতা। স্বামীজির একান্ত অনুরক্ত ভক্তদের কেউ কেউ তাঁকে নানা ভাবে আঘাত দিয়েছে। কিং নিবেদিতার পথ কেউ আটকাতে পারেনি। শিকাগো, ডেট্রয়েট, নিউইয়র্ক, ক্যানসাস, মিনিয়াপলিস এই সব শহর নিবেদিতা জয়

করে নিলেন। এখানে গড়ে উঠলো সাহায্যমণ্ডলী। এঁরা নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষে মিশনের কাজে টাকা পাঠাবেন।

অত্যন্ত পরিশ্রম করে নিবেদিতার শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। ঠিক করলেন এবার ভারতে ফিরবেন। নিউইয়র্কে থাকতে প্যাট্রিক গেডেসের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ হয়েছিল। প্যাট্রিক গেডেসের তখন জগৎ-জোড়া নাম। তিনি জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত। সমাজবিজ্ঞানী। য়ুরোপের ইতিহাস, শিল্পধারা— মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি এ সবের উপরে তাঁর অগাধ পড়াশুনো।

স্বামীজির তখন প্যারিসে যাবার কথা চলেছে। প্যারিসে হবে ধর্মের ইতিহাস-মহাসম্মেলন। স্বামীজি সেখানে আমন্ত্রিত বক্তা। প্যাট্রিক গেডেসও নিবেদিতাকে বিশেষ করে আমন্ত্রণ জানালেন। প্যারিসে একই সময়ে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন হবে। গেডেস সাহেব তার একজন কর্মকর্তা। তিনি নিবেদিতাকে ডাকলেন তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্যে।

স্বামীজি চলেছেন, নিবেদিতা তাই রাজীও হয়ে গেলেন। তিনি প্যারিসে গিয়ে গেডেসের সঙ্গে কাজ করবেন। তাঁর যাবার আগ্রহের আরেকটা কারণও ছিল জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন। জগদীশচন্দ্রের কাজে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষাও তাঁর ছিল।

নিবেদিতা প্যারিসে চলে এলেন। তাঁর কাজ হল অধিবেশনের রোজকার ভাষণগুলো গেডেসের নির্দেশ অনুসারে তৈরী করে রাখা। তাঁর বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া। আর তাছাড়া তিন মাসের মধ্যে একটা গ্রন্থাগার গড়ে তোলা। গেডেসের সংগে কাজ করতে গিয়ে নিবেদিতার মুস্কিল হলো। গেডেস তাঁর সব ভাষণেই নিজের ভাব আর ভাষা বজায় রাখতে চাইতেন। কিন্তু নিবেদিতাকে দিয়ে তা হবার নয়। নিবেদিতার নিজের বোধ শক্তি—নিজস্ব ভাষা দুই-ই ছিল। তিনি বিষয়কে যেমন বুঝতেন

তাকে তেমন ভাবেই খাড়া করতে চাইতেন। কিন্তু পুরোপুরি স্বাধীন ভাবে করতে পেতেন না। মন না চাইলেও নিবেদিতা গেডেসকে সাহায্য করে গেছেন। কেননা গেডেস সাহেব মহা-পণ্ডিত। গেডেসের সঙ্গ পেয়ে নিবেদিতা অনেক নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করেছেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের জন্যেও অপেক্ষা করছিলেন। জগদীশচন্দ্র ও অবলাদেবী প্যারিসে এলেন আগষ্ট মাসে।

প্যারিসে এসে স্বামীজি তাঁর এক প্রধান ভক্ত মিঃ লেগেটের বাড়ীতে উঠলেন। এই সময়ে ধীরে ধীরে স্বামীজির মনের পরিবর্তন ঘটছিল। মনে হত দেহ মন শ্রান্ত হয়ে পড়ছে। কাজের আগ্রহ কমে আসছিল। সব ব্যাপারেই কেমন উদাসীনতা তীব্র হয়ে দেখা দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের আভাস নিবেদিতার কাছে তীব্র হয়ে উঠলো। স্বামীজি তাঁকে আর কোনো পরামর্শ দিতে চান না—তাঁর কাজে উৎসাহ দেখান না। যেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হয়ে গেছেন। বেদনাদায়ক ব্যাপার। এরকম অবস্থা নিবেদিতা কোনদিনই কল্পনা করতে পারেননি।

প্যারিস থেকে স্বামীজি সমুদ্রতীরে লানিয়'তে মিসেস বুলের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। নিবেদিতা প্যারিস থেকে স্বামীজিকে চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তাঁর মনের বেদনা ছিল, অনুযোগ ছিল। কিন্তু স্বামীজি পত্রের উত্তর দিলেন অত্যন্ত নির্বিকার ভাবে। সে পত্রে স্বামীজির মনের অনেক ক্ষোভ, অনেক নিরাশা প্রকাশ পেয়েছিল।

তিনি বলেছেন, মহাকালের ডাক শুনছেন। জাগতিক ব্যাপার থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছে তার মনে প্রবল হয়ে উঠেছে। নিবেদিতাকে তিনি মিসেস বুলের কাছে সমর্পণ করে যাবেন।

স্বামীজি ভারতে ফিরে যাবার আগে নিবেদিতা কিছু দিন তাঁর কাছে কাটিয়ে গেলেন। স্বামীজি ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন নিবেদিতা যাবেন ইংলণ্ডে। সঙ্গে জগদীশচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী।

প্যারিসে জগদীশচন্দ্রের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। বিজ্ঞান সম্মেলনে তাঁর আলোচনার বস্তু ছিল গাছপালার ওপর বিদ্যুৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া। গাছপালার মধ্যেও যে প্রাণ আছে, চেতনা আছে, ব্যথা বেদনা আছে একথা তিনি প্রাঞ্জল ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন। জগদীশচন্দ্র তার আবিষ্কারের তত্ত্ব নিয়ে লণ্ডন যাবেন। সেখানে বিজ্ঞানীদের সভায় তিনি তার আবিষ্কৃত সত্য উদ্ঘাটিত করবেন।

লণ্ডনে এসে জগদীশচন্দ্রকে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জগৎ-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সভা রয়াল সোসাইটিতে তাঁর আবিষ্কারের কাহিনী পেশ করতে দিতে অনেক বৃটিশ বিজ্ঞানী বাদ সাধলেন। এই সব বাধার প্রাচীর দূর করবার জন্যে নিবেদিতা তৎপর হয়ে উঠ'লন। তাঁর আশা স্বামীজির মত জগদীশচন্দ্রও দুনিয়ার চোখে কীর্তি স্থাপন করে যাবেন।

স্বামীজিও জগদীশচন্দ্রের প্রতিভার গুণগ্রাহী ছিলেন। বহুবার বহু সভায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে গর্ব করতে গিয়ে তিনি জগদীশচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন। যে কাজে ভারতের সম্মান বৃদ্ধি পাবে —জগৎ সভায় ভারত উঁচু আসন পাবে এমন কাজে নিবেদিতা অক্লান্ত ভাবে খেটে যাবেন।

নিবেদিতা বিভিন্ন সভায় যান। ভাষণ দেন, বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করেন। এই অর্থ তার বিদ্যালয়ের কাজে লাগবে। আবার জগদীশচন্দ্রের জন্যেও বিভিন্ন যোগাযোগ করেন যাতে রয়াল সোসাইটির সভায় জগদীশচন্দ্র তাঁর আবিষ্কৃত সত্য প্রকাশ করতে পারেন। সকাল বেলায় জগদীশচন্দ্র আপন কাজে ব্যস্ত থাকেন। সন্ধ্যাবেলায় নিবেদিতা তাকে গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে শোনান।

শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটির বিজ্ঞানীদের সভায় বিশ্ব জয় করার সুযোগ পেলেন। এর পেছনে ছিল নিবেদিতার অক্লান্ত চেষ্টা।

লণ্ডনে নিবেদিতার পরিচয় হল রমেশ দত্তের সংগে। রমেশ দত্তের পণ্ডিত্যের কথা নিবেদিতা জানতেন। ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে রমেশ দত্তের বিরাট বই নিবেদিতার পড়া ছিল। তিনি ইংরিজিতে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী সংক্ষপে কবিতার আকারে সবে বের করেছেন। সে সময় কিছু ভারতীয় ছাত্র তাঁর কাছে ইতিহাস চর্চা করতো। নিবেদিতাও তাঁর কাছে গিয়ে ভারতের অর্থনীতি, ভারতের ইতিহাস নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। তাঁর বক্তব্য থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতেন। রমেশ দত্ত তাকে ভারতের কাহিনী নিয়ে বই লিখতে বললেন। নিবেদিতার ভাষণ তিনি শুনেছেন। তার লেখাও পড়েছেন। লেখার মধ্যে চিন্তার খোরাক পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন।

রমেশচন্দ্রের উৎসাহে নিবেদিতা "ভারতীয় জীবনের রহস্য—" (দি ওয়েব অব ইণ্ডিয়ান লাইফ) লিখতে শুরু করেন। এই লেখার কিছুটা পড়েই রমেশচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, অপরূপ হয়েছে, এ লেখা আপনাকে শেষ করতেই হবে।

নিবেদিতা নরওয়ে চলে গেলেন। নরওয়ের এক অখ্যাত গ্রামে বসে তিনি তার রচনা শেষ করলেন।

ইতিমধ্যে সারদাদেবী চিঠি দিয়েছেন ভারতে ফিরে আসবার জন্যে। খবর এসেছে স্বামীজি অসুস্থ।

নিবেদিতা বেলুড়ে পৌঁছোলেন। তখন ১৯০১ সাল, নভেম্বর মাস।

এসে দেখলেন স্বামীজি অনেকটা কাবু হয়ে পড়েছেন। দিনের পর দিন রোগে ভুগে তার জীবনী শক্তি ক্ষয়ে আসছে। ডায়াবিটিস আর হাঁপানি। কিন্তু স্থির চিত্তে সমস্ত দেহযন্ত্রনা সহ্য করেন। এ দেহ একদিন ছেঁড়া কাপড়ের মত ফেলে রেখে যেতে হবে। কীসের মায়া? সেই দীপ্ত তেজী পুরুষের মনের

ভাব মুখের ভাব একেবারেই নির্লিপ্ত হয়ে গেছে। তবু নিবেদিতাকে দেখে তা আবার শিশুর মত হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

এই সময়ে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসবে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছেন নেতারা, কর্মীরা। স্বামীজির সংগে দেখা করতে আসেন প্রায় সবাই। স্বামীজি সন্ন্যাসি হলেও তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম সকলেরই বিস্ময়ের বস্তু। স্বামীজির প্রাণশক্তি, তেজ, উন্মাদনা তাদের উদ্দীপিত করে তুলতো। রোজই বিকেলের দিকে তাঁরা আসতেন—ঘরোয়া আলোচনায় দেশের মংগল চিন্তার কথা উঠত। উঠতো জাতীয় কংগেসের ভবিষ্যৎ কাজের কথা।

ঘন্টার পর ঘন্টা স্বামীজি কথা বলে যেতেন। উৎসাহের কমতি ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে আসতো ক্লান্তি। তখন বলতেন নিবেদিতা। নিবেদিতার মুখ দিয়ে যেন স্বামীজির মনের কথাই বেরিয়ে আসে। নিবেদিতা যা বলেন তাতেই স্বামীজির সায় ছিল।

সেবার জাপান থেকে এলেন মিস্ ম্যাকলয়েড। সঙ্গে ছিলেন প্রিন্স ওডা আর ওকাকুরা। জাপানে এক ধর্ম মহাসম্মেলন হবে। স্বামীজিকে যোগদানের নিমন্ত্রণ করার জন্যেই তাঁরা ভারতবর্ষে এসেছেন। স্বামীজি উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। দূর হয়ে গেল তাঁর অসুখের ভাবনা। তিনি যাবার জন্যে কথা দিয়ে দিলেন।

শিল্পী হিসেবে ওকাকুরার জগৎ জোড়া খ্যাতি ছিল। ওকাকুরা এসে সুরেন ঠাকুরের বাড়ীতে ওঠেন। সেখানেই পরিচয় হল অবনীন্দ্রনাথের সংগে। নিবেদিতার সংগে ওকাকুরার পরিচয় হয় বেলুড় মঠে, স্বামীজির সাক্ষাতেই। ওকাকুরার শিল্পী মন নিবেদিতাকে মুগ্ধ করেছিল। ভারতীয় শিল্পের আদর্শে অবনীন্দ্রনাথকে ওকাকুরা অনেকখানি প্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি কয়েকজন জাপানী শিল্পীকে অবনীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন।

সুরেন ঠাকুরের সংগে নিবেদিতার পরিচয় ছিল আগে থেকেই।

সেই সূত্রে অবনীন্দ্রনাথও এসে পড়লেন নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। সুরেন ঠাকুর, ওকাকুরা, নিবেদিতা ও অবনীন্দ্রনাথ, এই চারজনের অপরূপ মিলন ঘটলো। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সেই. এক শুভদিন। ভারতীয় শিল্পের নবজন্মের কাহিনীতে নিবেদিতার নাম অবনীন্দ্রনাথের সংগে লেখা থাকবে। আবার সুরেন ঠাকুরের বিপ্লবের কাজে ওকাকুরাও ইন্ধন জুগিয়েছিলেন। ওকাকুরার জ্বলন্ত দেশপ্রেমের স্পর্শ নিবেদিতাও পেলেন। ভারতের মুক্তিচিন্তায় ওকাকুরা আর নিবেদিতার যোগাযোগ একটি আশ্চর্য ব্যাপার। দেশের শিল্প আর দেশের জাগরণ দু ব্যাপারেই নিবেদিতার ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ। এ দুটো কাজে দুজনেই এক রকমের চিন্তা করতেন।

নিবেদিতা আর ওকাকুরার কথায় অবনীন্দ্রনাথ একবার লিখেছিলেন, "কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম তার সংগে আমার দেখা হয় আমেরিকান কনসালের বাড়ীতে। ওকাকুরাকে রিসেপ্‌শন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা। গলায় ছোট, ছোট, রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা একদিকে, তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে। মনে হল যেন দুই কেন্দ্র থেকে দুটি তারা এসে মিশেছে। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই।"

"আর একবার দেখেছিলুম তাকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়ীতে।...সন্ধ্যে হয়ে এল এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালী নয়, সোনালী রূপালীতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেয়েরা তার কাছে এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেবরা কাণাকানি করতে

লাগল। উড়রফ, ব্লান্ট এসে বললেন, 'কে এ?' তাদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।"

"নিবেদিতা মারা যাবার পর একটি ফটো গণেন মহারাজকে দিয়ে যোগাড় করে ছিলুম, আমার টেবিলের উপর থাক্‌তো সেখানি।' লর্ড কারমাইকেল, যাঁর মত আর্টিষ্টিক নজর বড় কারো ছিল না।……সেই কারমাইকেল একদিন আমার টেবিলের উপর নিবেদিতার ফটোখানি দেখে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন' এ কার ছবি?' বললুম, 'সিস্টার নিবেদিতার'। তিনি বললেন, 'এই সিস্টার নিবেদিতা? আমার একখানি এরকম ছবি চাই। বলেই আর বলা কওয়া না, সেই ছবি খানা বগল দাবা করে চলে গেলেন। ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে।"

নিবেদিতার এমন রূপ বর্ণনা আর কেউই করতে পারেননি।

ওকাকুরার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও স্বামীজির জাপানে যাওয়া হলো না। শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসছে। এবার বুদ্ধগয়া যাবার ইচ্ছে হল। ওডা, ওকাকুরা আর মিস ম্যাকলয়েডকে নিয়ে স্বামীজি বৌদ্ধতীর্থ ভ্রমণ করে এলেন। স্বামীজি ফিরে এলেন কিন্তু শরীর ভেঙ্গে গেছে। সেই শরীর সারাবার জন্যে তাঁকে হিমালয়ের পাদদেশে মায়াবতী আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু অসুখটা বেড়েই গেল। ফিরে চলে আসতে হল বেলুড়ে।

সেই অসুখ নিয়েই স্বামীজি হঠাৎ একদিন হাজির হলেন বাগবাজারে। নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়ে। স্বামীজিকে দেখেই নিবেদিতা চমকে যান। কী করবেন স্বামীজিকে নিয়ে। কী দেখাবেন। খুশীতে ডগমগ হয়ে ওঠেন তিনি। এ বাড়িটা বিদ্যালয়ের নতুন বাড়ী। ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়ীটা নিবেদিতা স্বামীজিকে দেখালেন। স্বামীজি বললেন, বাড়ীটা তোমার কাজের উপযোগী হয়েছে।

ছাত্রীদের জন্যে নিবেদিতা যে সব মাটির খেলনা এনেছেন তাই এনে স্বামীজিকে দেখান। সেইগুলো নিয়ে স্বামীজি কিছুক্ষণ খেলা করেন। আরো কিছুক্ষণ নানান কথা বলে কাটালেন।

যাবার সময়ে বলে গেলেন, কাল সকালে বেলুড়ে এসো—তোমার কাজের কথা মঠের সাধুদের বুঝিয়ে দেব। স্বামীজিকে কেমন যেন মনে হল। স্বামীজির কথা বলা চলা, বসা, সবই পাল্টে গেছে।

আরেকদিন নিবেদিতা নিজেই বেলুড় মঠে চলে এলেন। হঠাৎ চলে আসা। স্বামীজি হলেন খুব খুশী। খেয়ে যেতে বললেন। স্বামীজি নিবেদিতার খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। নিবেদিতা যখন খেতে বসলেন স্বামীজি নিজে তদারক করতে শুরু করে দিলেন। স্বামীজির মেজাজ সেদিন খুবই আনন্দময়। খাওয়া সেরে নিবেদিতা উঠতে যাচ্ছেন স্বামীজি নিবেদিতার হাতে ঘটি থেকে আস্তে আস্তে জল ঢেলে দিলেন। হাতও মুছিয়ে দিলেন তোয়ালে দিয়ে।

নিবেদিতা হতবাক! নিশ্চল!

বললেন, 'আপনি এসব করছেন কেন।'

ম্লান হেসে স্বামীজি বললেন, 'যিশু যে তার শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন।'

'কিন্তু সে ত শেষের দিনে'

কথাটুকু বলেই নিবেদিতার গলায় আর স্বর আসে না। মুখ চোখ আশঙ্কায় কালি হয়ে যায়। স্বামীজি আশীর্বাদ করেন। নিবেদিতা স্থির হয়ে চোখ বুজে তা গ্রহণ করেন। অনুভব করেন স্বামীজির চোখ দিয়ে স্নেহ আর করুণা উদ্বেল হয়ে ঝরে পড়ছে।

পরের দিন সকালে স্বামীজি নিবেদিতাকে একটা কেক পাঠিয়ে দিয়েছেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন নিবেদিতা। মুহূর্তের

মধ্যে পৃথিবীর রূপ যায় পাল্টে। নিবেদিতা কপালে ছোঁয়ান স্বামীজির সেই আশীর্বাদ।

বিকেল বেলা ছাদে চলে যান। চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন। ধ্যানে গুরুকে অনুভব করেন চোখের সামনে। অনেকক্ষণ সম্বিৎ হারা হয়ে ডুবে থাকেন। ধ্যান ভেঙে যখন উঠলেন। তখন গভীর আনন্দে মগ্ন হয়ে গেলেন।

পরদিন খুব ভোর, কি ভোর হয়নি, এমন সময়ে কে যেন নিবেদিতার সদর দরজায় আঘাত দিল।

একজন চিঠি নিয়ে এসেছেন মঠ থেকে। সারদানন্দজীর চিঠি। চিঠিতে লেখা, 'নিবেদিতা, সবশেষ। কাল রাত ন'টায় স্বামীজি ঘুমিয়ে পড়েছেন চিরতরে।'

নিবেদিতা ছুটে চললেন বেলুড়ে।

গেরুয়া পরা দেহ মেঝেতে শোয়ানো। হলদে ফুলে সর্বাংগ ঢাকা। সিল্কের পাগড়ী মাথায় বাঁধা। নিবেদিতা মাটিতে বসে পড়েন। কোলে তুলে নেন স্বামীজির মাথা, পাশেই ছিল তাল পাতার এক পাখা। কুড়িয়ে নিয়ে দেহে বাতাস করতে থাকেন। নিবেদিতার চোখে মুখে অপরূপ স্তব্ধতা!

চোখের জল সব শুকিয়ে গেছে···

স্বামীজি চলে গেলেন। নতুন করে এগিয়ে চলার দায়িত্ব এসে পড়ল। স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন সকল মানুষের সেবা ও ধর্মচর্চা এই দুই আদর্শে অবিচল রইলো। দেশের অন্য কোন সমস্যা বা রাজনীতি বিষয়ে রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসীরা চিন্তা করবেন না। নিবেদিতা এই সংঘেরই সদস্যা। ভারতের প্রাচীন আদর্শ নিয়ে এ যুগের মেয়েদের শিক্ষিতা করে তোলার স্বপ্ন নিয়েই একদিন তিনি এদেশে এসেছিলেন। এখনও তাঁর লক্ষ্য ঠিকই

আছে। কিন্তু কর্মের পরিধি গেছে বেড়ে। স্বামীজির মৃত্যুর পূর্বে গুরুদেবের সঙ্গে পশ্চিমের দেশগুলি ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন নিবেদিতা। তখনই অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন হিন্দুধর্মকে মিশনারীরা যেমন হীন প্রমাণ করার চেষ্টা করে, তেমনি ভারত পরাধীন বলেও তার অপমানের শেষ নেই।

ভারতের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি বিদেশে সম্মান পান না দেশ পরাধীন বলে। আবার দেশের মধ্যেই জামসেদজী টাটা, শ্রীমতী অ্যানী বেশান্ত এঁরা যখন দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন, তাতেও কান দেওয়া দরকার মনে করে না শাসক ইংরেজ সরকার। এর পরেও আছে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দেশবাসীর নিজ জাতের সাধারণ লোকের জীবন ও শিক্ষার ওপর নিদারুণ অবহেলা। সুতরাং ঘরে ও বাইরের এই অপমান ও অবহেলা থেকে তাঁর প্রাণের প্রিয় ভারতকে মুক্ত করতেই হবে। সারা দেশবাসীকে জাগাতে হবে আত্মচেতনায়—জাগাতে হবে স্বাদেশিকতায়।

কিন্তু এ ব্রত তিনি তো সম্পন্ন করতে পারবেন না যদি তিনি কেবলমাত্র বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনায় নিজেকে যুক্ত রাখেন। অথচ নিজের পথে দেশের আহবানে সাড়া দিতে গেলে রামকৃষ্ণ সংঘও তাকে সদস্যা করে রাখতে পারেন না। সংঘ বা মঠের সঙ্গে নিবেদিতার ধর্মের সম্বন্ধ। একে তো ছিন্ন করা যায় না। আবার দেশকে জাগানোর নতুন প্রেরণাও অস্বীকার করতে পারছেন না। দোলায়মানা নিবেদিতা অবশেষে সংঘের প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়েও, নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে। তার প্রত্যেক কাজের জন্য তিনিই দায়ী থাকবেন। এ বিষয়ে সংঘের কোন দায়িত্ব থাকবে না।

গুরুদেবের প্রয়াণ ঘটেছে—সংঘপদ বিযুক্তা নিবেদিতার

সামনে রইল অস্পষ্ট কিন্তু সম্ভাবনাময় কর্মের জগৎ। তেজস্বিনী নিবেদিতা একাকী অভীঃ মন্ত্রে কর্ম বরণ করে, নতুন পথে যাত্রা সুরু করলেন। এই সময় তিনি বান্ধবী মিসেস লেগেটকে লিখেছিলেন,—আমাদের প্রিয়জন মারা যান নি। তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন। আমি শোক করতে পারি না। আমি কেবল কাজ করে যেতে চাই।'

কাজই আরম্ভ করলেন নিবেদিতা। দেশকে জাগানোর কাজ। ভারত একদিন তার শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশ বলে সম্মান পেয়েছিল। স্বামীজীর মানস কন্যা নিবেদিতা স্বপ্ন দেখলেন ভারতবাসীর এই হারানো গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। আগামী দিনে ভারতবাসী আবার যেন বিশ্বে পথ দেখাতে পারে। এর জন্যে অতীতের কীর্তিকে যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে; তেমনি বর্তমানে বিজ্ঞানকেও সঙ্গে নিতে হবে। এই কঠিন ব্রত নিয়ে নিবেদিতা নামলেন তাঁর বাগ্মিতা, লেখনী আর অবাধ প্রাণশক্তি নিয়ে। ভারতের জাতীয় জীবনের এমন কোন দিক নেই যা নিয়ে ভারত-কন্যা নিবেদিতা চিন্তা না করেছেন। ভারতের রাজনীতি সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, শিক্ষা সমস্ত দিকেই তিনি নতুন আশার আলো দেখিয়েছেন। দেশকে এইভাবে জাগানোর কাজেই নিজেকে তিলে তিলে দান করেছেন নিবেদিতা। মনের মধ্যে তার একমাত্র সাধ, বড়ো হবে—আবার ভারত বড়ো হবে।

নিবেদিতা রামকৃষ্ণের সংঘ ছেড়ে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিপদ, আপদে গুরুভাইরা সর্বদাই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্বামীজির মতোই নিবেদিতা সারা ভারত ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। ভারতের সাধারণ নরনারীর সংগে তাঁকে পরিচিত হতে হবে। নিবেদিতা বেরিয়ে পড়লেন ১৯০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাই, নাগপুর, ওয়ার্ধা অমরাবতী, বরোদা সফরে। হাজার

হাজার লোকের সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন। স্তব্ধ হয়ে শুনেছে সবাই। শুনেছে ভারতীয় নারীর কথা, হিন্দুধর্মের কথা, স্বামীজির কথা। নিবেদিতা দেশ ভ্রমণ করেছেন আর মানুষের মন জয় করেছেন।

নিবেদিতা যখন বরোদায় এলেন, সাক্ষাৎ হলো অরবিন্দের সংগে। রমেশ দত্তও ছিলেন সে সময়ে বরোদায়। অরবিন্দ তখন বরোদার রাজার শিক্ষা দপ্তরে কাজ করেন। বরোদার রাজার আমন্ত্রণেই নিবেদিতা এখানে এসেছেন। অরবিন্দ নিবেদিতাকে ষ্টেশন থেকে রাজার অতিথিশালায় নিয়ে আসেন। যে কদিন তিনি বরোদায় ছিলেন দেশের কথা নিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে তার নানা আলাপ আলোচনা হয়। সেদিন কেইবা জানতো নিবেদিতার সংগে অরবিন্দের এই যে আলাপ ভারতের ইতিহাসে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা।

মধ্য ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণের পর নিবেদিতা এলেন দক্ষিণ ভারতে—মাদ্রাজে। এখানেও বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতা সমানে চলল। একমাস মাদ্রাজে থেকে, সকলের মন জয় করে নিয়ে ১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে নিবেদিতা কলকাতায় ফিরে এলেন।

কোলকাতায় ফিরে নজর দিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের উন্নতির দিকে। এতদিন নানা ঝড় ঝঞ্ঝায় বিদ্যালয়ের দিকে শান্তভাবে তিনি মন দিতে পারছিলেন না। এবার এই দিকেই তিনি মন দিলেন।

অল্প কয়েকটি শিশু ছাত্রী ছিল বিদ্যালয়ে। এদের না ছিল কোন নির্দিষ্ট পড়ার বিষয়। না ছিল নির্দিষ্ট বই। নিবেদিত কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে পড়াতেন। শিশুরা পড়বে তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী। তাদের স্বভাব অনুযায়ী। জোর করে শিশুদের কিছু শেখান যায় না। শাসন করলে, জোর করলে পড়ার আনন্দই

যায় মাটি হয়ে। নিবেদিতা কত নতুন নতুন উপায়ে ছোটদের পড়াতেন। যাতে পড়ার আনন্দে শিশুর আগ্রহ সব সময় বজায় থাকে। এখানে ছোটরা তেঁতুল বিচি নিয়ে খেলা করতে করতে প্রথম গুণতে শিখত। তারপর স্লেটে অঙ্ক কষা। নিবেদিতা তাদের রঙ্, তুলি, কাগজ দিয়ে ছবি আঁকতে বলতেন। কখন তারা মাটী দিয়ে পুতুল গড়ত। কখন বা অবাক হয়ে তার মুখ থেকে নানা পৌরাণিক গল্প শুনত।

এবার একটি আলাদা বড়দের বিভাগ খোলা হল। এখানে বড় মেয়েরা—বাড়ীর বউ, বিধবা মেয়েরা পড়া ও সেলাই শিখতে আসতেন। আমাদের সেই ফেলে আসা দিনগুলোতে মেয়েদের পড়াশুনাকে কেউই ভালো বলে মনে করত না। কিন্তু বাগবাজারের প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে তিনি আন্তরিক বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলেন। পুরুষ অভিভাবকদের কাছে নিজের কাজের এমন বিশ্বাস এনেছিলেন যে বিদেশিনী হওয়া সত্ত্বেও বাড়ীর শিশু, মেয়ে বউদের, তারা নিবেদিতার ইস্কুলে লেখাপড়া শেখাতে পাঠাতেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা আর বড়দের পড়ানোর ব্যাপারে নিবেদিতা যাঁর খুব সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি ভগিনী কৃষ্টিন। কৃষ্টিন আমেরিকার মেয়ে। নিবেদিতার মতেই একদিন তিনি স্বামীজির আদর্শ মাথায় করে এদেশে এসেছিলেন। শান্ত ভক্তিমতী এই মহিলা বিদ্যালয়ের উন্নতিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতী সুধীরা নামেও একজন মহিলা সারাজীবন বিদ্যালয়ের কাজে উৎসর্গ করেন। ভগিনী কৃষ্টীন ও সুধীরা বড়দের পড়াতেন। নিবেদিতা সময় করে বড়োদের শেখাতেন গণিত ও চিত্রবিদ্যা। কখনো নিতেন ইংরাজী, ইতিহাস। এই বড়রাই বিদ্যালয়ের ছোটদের দায়িত্ব নিত। কিন্তু ছোটদের কেমন করে আনন্দ দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে শেখাতে হবে, নিবেদিতা বড় ছাত্রীদের তা খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন।

নিবেদিতা বলতেন শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মনের কতকগুলো মহৎ ভাবের জাগরণ। এই ভাব জাগানো যে কী নিবেদিতার শিক্ষায় প্রতিদিন তা ছাত্রীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত। একদিন তিনি পড়াচ্ছেন রাজপুতানার ইতিহাস। প্রসঙ্গত এসে গেল চিত্তোরের কথা। বীরের দেশ চিতোর। নিবেদিতা চিতোর ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেই স্মৃতি ভেসে উঠল তখন তাঁর মনে। তিনি চিতোর পাহাড়ে উঠে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসেছিলেন। চোখ বুজে অনুভব করেছিলেন জলন্ত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাণী পদ্মিণী। কি সুন্দর সেই দৃশ্য। ছাত্রীদের সে অভিজ্ঞতা বোঝাতে নিবেদিতা ক্লাসের মধ্যেই চোখ বুজে, হাত জোড় করে বসলেন। তাঁর মন চলে গেছে সেই অতীতের মাঝে। ছাত্রীদের মুখে কথা নেই। তারা জীবন-ইতিহাসের পড়া নিচ্ছে।

ভারতবর্ষের কথা উঠলেই তিনি ভাবমগ্না হয়ে পড়তেন। মেয়েদের বলতেন—তোমরা সকলে জপ করবে ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ! মা, মা,মা। বলেই নিজের জপের মালায় জপ করতে করতে বলতেন, মা, মা, মা। দেশের কথা, জাতির কথা শুধু বইয়ে পড়বার বিষয় নয়। একে সত্য বলে অনুভব করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে। একথাই নিবেদিতা বারবার ছাত্রীদের বোঝাতেন।

নিবেদিতার শিক্ষিকা জীবনের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন সরলাবালা সরকার। নিবেদিতা বিশ্বাস করতেন শুধু ঘরে বসে পড়াশুনোতেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ভ্রমণ শিক্ষার একটা বড় অঙ্গ। নিবেদিতা ছাত্রীদের দেশ ভ্রমণে নিয়ে যেতে চাইতেন। কিন্তু এতে টাকাকড়ি বেশী লাগে বলে পারেননি। তাই তিনি ছাত্রীদের নিয়ে যেতেন যাদুঘরে—আলিপুর পশুশালায়। মেয়েরা চোখে দেখত। তিনি মুখে মুখে শেখাতেন।

যাদুঘরে বৌদ্ধযুগের দেব মূর্তির পরিচয় দিচ্ছেন নিবেদিতা।

হঠাৎ চোখে পড়ল 'কাম্য প্রস্তর'। মহারাজ অশোক যার সামনে বসে কামনা করেছিলেন। নিবেদিতা ছাত্রীদের ঐ পাথরের সামনে চোখবুজে বসে কিছু কামনা করতে বললেন। নিজেও বসলেন ছাত্রীদের মতই। কিছুক্ষণ পরেই জিজ্ঞেস করলেন 'তোমরা কি কামনা করলে?' ছাত্রীরা চুপ করে রয়েছে। হয়তো বা লজ্জায় পড়ে গেছে। নিবেদিতা ছাত্রীদের ইতস্ততঃ ভাব দেখে হেসে বললেন 'সত্যই তো, কামনার কথা মনেই রাখতে হয়। মুখে বলতে নেই।'

কত আপনার ছিলেন তিনি ছাত্রীদের। প্রতি বছরে ভক্তি-ভরে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা হত। তিনি ছাত্রীদের নিয়ে পূজোর আনন্দে মেতে উঠতেন। একবার খবর এল, শ্রীমা আসবেন বিদ্যালয় দেখতে। ছোট মেয়ের মতো খুশী হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। বিদ্যালয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হলো। শ্রীমাকে ছাত্রীরা কেমন করে বরণ করবে সব তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেললেন। নির্দিষ্ট দিনে এলেন শ্রীমা। আনন্দে অধীর নিবেদিতা চারিদিকে ঘোরাঘুরি করছেন অকারণে হাসছেন কখনো বা খুশীতে ছাত্রীদের এমনকি দাসীর গলাও জড়িয়ে ধরেছেন।

হয়তো বিদ্যালয়ের গরমের ছুটি পড়বে। বিদ্যালয়ের দিন তিনি ছাত্রীদের কিছু জল যোগের ব্যবস্থা করেছেন। ফল মিষ্টির ছোট ছোট ঠোঙাগুলি শিক্ষিকারা ঝুড়ি থেকে ছাত্রীদের হাতে তুলে দিলেন। খাওয়া শেষ হলো। ছাত্রীরা শালপাতার ঠোঙাগুলো ফেলবে কোথায়? নিবেদিতা আগে থেকেই ঝুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার মধ্যেই ঠোঙা ফেলল ছাত্রীরা। তিনি যে ছাত্রীদের মা। সেবাই তাঁর একমাত্র ব্রত।

ছাত্রীদের আঁকা আলপনা তিনি নিজের ঘরে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছেন। ছাত্রীদের তৈরী সব কিছুই তাঁর কাছে অত্যন্ত আদরের, অত্যন্ত গর্বের জিনিস। কিন্তু যখন এরাই দুষ্টুমি করে? কথা না

শুনে একজনের প্রশ্নের উত্তর অন্যজনে দেয়? নিবেদিতা এমন করে অপরাধী ছাত্রীর দিকে তাকান; কিংবা যখন তাকে একটা প্রশ্নেরও উত্তর জিজ্ঞাসা করেন না; তখন ছাত্রীটি বুঝতে পারে এরকম ভুল আর সে কখনো করবে না। ভয়ে দুঃখে চোখে জল এসে যায়।

এই বিদ্যালয়ের জন্যে কী অসম্ভব কষ্ট শিকার করতে হতো নিবেদিতাকে। বিদ্যালয়ের যে ঘরে তিনি থাকতেন সেটা ছিল একটা চাপা ছোটঘর। ভাল ভাবে বাতাস ঢুকতে পারতো না ঘরে। নিজের জন্যে কোন পাখার ব্যবস্থা করেননি তিনি। এমনকি টানা পাখাও নয়। এই গরম, বদ্ধ ঘরে বসেই তিনি বিদ্যালয়ের কাজ করতেন। নানা লেখা শেষ করতেন। যে লেখার আয়ে তিনি বিদ্যালয় চালাতেন। গরমে বসে লেখাপড়া করতে করতে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে উঠত। মাথা ধরে যেত। যন্ত্রণায় কপালে হাত রেখে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। কষ্টকর একটানা পরিশ্রম করেই, তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যেত। অনেকেই তাঁকে বারণ করত ঐ ঘরে থাকতে। কিন্তু যে ঘরে স্বামীজি এসেছেন; সে ঘর তো তাঁর পুণ্য তীর্থ। নিবেদিতা কারো মানা শুনতেন না।

বিদ্যালয়ের কাজে টাকাকড়ি অভাব হলে, তিনি আগে নিজের খরচ কমাতেন। তিনি তো সন্ন্যাসিনী। খাওয়া দাওয়ার খরচ সামান্যই। তাকে আরো সামান্য করতে তিনি চেষ্টা করতেন। গুরুদেবের থেকে সেবার মন্ত্র নিয়েছিলেন নিবেদিতা। এই মন্ত্রকে প্রতিদিনের কাজের মধ্যে দিয়ে সত্য করে তুলতেন তিনি।

১৯০৩ এর জুলাই মাসে নিবেদিতা দার্জিলিং যান। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিলেন ভগিনী কৃস্টীন। এখানকার নির্জন, শান্তিময় পরিবেশে তিনি লেখার কাজে ব্যস্ত রইলেন। এখানে থেকে

তিনি শেষ করবার চেষ্টা করেন তাঁর বিখ্যাত বই 'ভারতীয় জীবনের রহস্য'। এটা আগেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯০৪ সালে বইটা বের হয়। বইটিতে হিন্দুসমাজের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, পুজো, পার্বনের কথা খুব দরদ দিয়ে তিনি বলেছেন।

১৯০৪ সাল এসে গেল। এই বছরটিতেও নিবেদিতা ভারতের অনেকগুলি তীর্থ আর ঐতিহাসিক স্থান দেখে ফিরেছেন। সারা বছর ধরে বাঁকীপুর, পাটনা, রাজগৃহ, কাশী, বুদ্ধগয়া, মায়াবতী প্রভৃতি কত জায়গায়ই না বেড়িয়েছেন। এই বেড়াবার সময় ছুটো উদ্দেশ্য তিনি পূর্ণ করেছেন। একদিকে তিনি নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। অন্যদিকে ঐতিহাসিক জায়গাগুলির অতীতের গৌরব অনুভব করতে চেয়েছেন। এবারের ভ্রমণের মধ্যে বুদ্ধগয়া রাজগৃহ, নালন্দা প্রভৃতি বেড়িয়ে তিনি অশেষ আনন্দ পান।

এই বছরের প্রথম দিকে নিবেদিতা একবার বুদ্ধগয়া যান। বেশীদিন তিনি বুদ্ধগয়ায় থাকতে পারেননি। অথচ মনে মনে তিনি বৌদ্ধ তীর্থস্থানটিকে ভালো করে দেখে নিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্যে অক্টোবর মাসে পূজার ছুটিতে আবার তিনি বুদ্ধগয়ায় ফিরে এলেন। এবার দল বেশ ভারী হল। নিবেদিতার সঙ্গে এলেন কৃস্টীন, জগদীশচন্দ্র, অবলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য যদুনাথ সরকার। এঁরা ছাড়াও ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সদানন্দ ও স্বামী শঙ্করানন্দ।

নিবেদিতার আশ্চর্য অনুভূতি ছিল। যখনই যে বিখ্যাত জায়গায় তিনি গেছেন—সেই জায়গাটি কেন খ্যাতিলাভ করেছিল, সেই খ্যাতিলাভের সময়ের দিনগুলি কেমন ছিল—সমস্তই তিনি আলোচনা করতেন। ঘুরে ঘুরে সমস্ত কিছু দেখতেন। আর চিন্তার মধ্যে যেন একেবারে তিনি অতীতের দিনে ফিরে যেতেন।

বুদ্ধগয়ায় গিয়েও নিবেদিতা বহু আগেকার দিনগুলোকে নতুন করে জাগিয়ে তুললেন।

বুদ্ধগয়া। এখানে আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, যে গাছের তলায় বসে বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন, সকলে সেই গাছটি দেখলেন। সন্ধ্যাবেলায় সকলে সেই গাছের তলায় বসে বুদ্ধদেবের কথা গভীরভাবে মনে করতে লাগলেন। একদিন বেড়াতে বেড়াতে উরুবেলা গ্রামে এলেন। এই গ্রামেই থাকতেন সুজাতা। সুজাতা বুদ্ধদেবকে উপবাসের পর পায়েস রেঁধে খাইয়েছিলেন। আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠলেন নিবেদিতা। তিনি এই গ্রামের পবিত্র মাটি হাতে করে তুলে নিলেন।

বুদ্ধগয়ার পর সকলে এলেন রাজগৃহে। রাজগৃহের কথা মহাভারতে আছে। মগধের রাজা জরাসন্ধকে বধ করতে শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে এখানে এসেছেন। রাজগৃহ বৌদ্ধতীর্থও বটে। নিবেদিতা যতই জায়গাটি দেখতে লাগলেন বুদ্ধদেব, রাজা বিম্বিসার সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর মনে জাগতে লাগল। এই প্রাচীন নগরীর এক দরজা দিয়ে করুণাময় বুদ্ধদেব ছাগশিশু কাঁধে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। নিবেদিতা সে জায়গাটি খুঁজে বার করলেন। খুঁজে বার করলেন কোথায় ছিল অম্বপালির আম্রকানন। বহু সময় নিবেদিতা এই পুরনো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একলা ঘুরে বেড়াতেন। ইতিহাসের পাতাগুলো যেন সব জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের প্রথম পরিচয় হয় বরোদায়। নিবেদিতা ডন সোসাইটীতে যোগ দিলেন। গড়ে তুললেন বিবেকানন্দ সোসাইটী। ধর্মের সংগে জাতীয়তার মিলনে এই দেশ এই জাতি তার বহুদিনের ঘুম ভেঙে জেগে উঠবে। এই ছিল

নিবেদিতার ধারণা। ডন সোসাইটীতে যোগদান আর বিবেকানন্দ সোসাইটী গড়ে তোলার পেছনে নিবেদিতার মনে এই আদর্শই কাজ করছিল।

এবারে নতুন জীবন শুরু হবে। কেননা ইতিমধ্যে নিবেদিতা এদেশের নবজাগরণের সংগে পরিচিত হয়ে গেছেন। জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সতীশ মুখোপাধ্যায়, সুরেন ঠাকুর, ওকাকুরা—এদের ঘনিষ্ট সংযোগে এসেছিলেন। এদেশের শিল্পে, বিজ্ঞানে, বিপ্লবের গুপ্ত আয়োজনের মধ্যে নিবেদিতা ভারত-জননীর দৃপ্ত চেহারা দেখে নিয়েছিলেন।

তবু এই দেশকে এই দেশের সাধারণ মানুষকে আরো ভালো ভাবে চিনতে হবে। স্বামীজি ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অশ্রান্তভাবে ঘুরেছেন। এই দেশের মানুষের সংগে, মাটির সংগে অন্তরংগ ভাবে মিশেছেন। নিবেদিতাও তাই কামনা করলেন।

কিছু দিন আগে তাঁর সংগে পরিচয় হয়েছিল ওকাকুরার। ওকাকুরা শিল্পী, ওকাকুরা স্বদেশ-প্রেমিক। সমস্ত এশিয়াকে নবজাগরণের আলোয় উদ্ভাসিত করে দেখায় তাঁর অদম্য ইচ্ছে ছিল। তিনি বইও লিখেছিলেন—'প্রাচ্যের আদর্শ' (দি-আইডিয়েলস্ অব দি ইষ্ট)। জাপানের নবজাগণের ইতিহাসের কথা বলে ভারতের দুঃখমোচনের কথা তুলেছেন। জাপানের উদাহরণে ভারতকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন তাঁর বই লিখে।

এই সময়ে দেখা হয়ে গেল অরবিন্দের সঙ্গে। বরোদারাজ সয়াজীরাও গায়কোয়াড় নিবেদিতার গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন। অরবিন্দ নিবেদিতার লেখার সংগে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ভাল লেগেছিল নিবেদিতার 'কালী দি মাদার' বইটি। অরবিন্দ সেই সময়ে বাংলায় গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সংগে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছেন। তাঁর যোগাযোগ ছিল সরলা দেবীর সংগে,

সুরেন ঠাকুরের সংগে। বরোদায় অরবিন্দের সংগে কথাবার্তায় তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ:রূপ নিবেদিতার চোখে পরিষ্কার ফুটে উঠলো।

নিবেদিতা বললেন, 'আপনি এখানে আছেন কেন, কলকাতায় চলে আসুন, আপনার কাজ সেখানেই।'

নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আগে অরবিন্দের প্রেরণায় বারীন ঘোষ আর যতীন বাঁড়ুজ্জে বাংলায় গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলছিলেন। অরবিন্দের কাছ থেকে নিবেদিতা সেই খবরটি পেয়ে গেলেন।

কোলকাতায় ডন সোসাইটীর মাধ্যমে বারীন ঘোষের সংগে নিবেদিতার যোগাযোগ হয়েছিল। নিবেদিতা তাঁর নিজের লাইব্রেরির দেড়শো বই বারীন ঘোষ আর যতীন বাঁড়ুজ্জের গুপ্ত সমিতিকে দিয়ে দিলেন।

১৯০৩ সালের কথা। বাংলার ছেলেরা তখন ডন সোসাইটীর নামে পাগল। সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাতা। 'ডন' নামে একটা কাগজও বেরুত। এই সোসাইটী ছাত্রদের স্বদেশের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ কোরতো। এর কর্মীরা ছিলেন বাছাই করা ছাত্রেরা। তাদের ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা নিতে হত।

সতীশ মুখোপাধ্যায়ের সংগে পরিচিত হবার পর থেকেই নিবেদিতার কাছে তাঁর আনাগোনা সুরু হল। নিবেদিতার বাড়ীতে হত বৈঠক। সেখানে তখন বাংলার সব বিখ্যাত লোকেই আসতে শুরু করেছেন। প্রতিদিনই জমজমাট আসর বসতো। শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, সাহিত্য, কী না আলোচনা হত। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, জননেতা ছাত্রের দল—সবাই আসতেন। কিন্তু সব আলোচনার মূল ছিল স্বাদেশিকতা। এমনকি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক র‍্যাটক্লিফ সাহেব আসতেন। নিবেদিতার ঠেলায় পড়ে তাঁকেও উদারপন্থী হতে

হয়েছিল। স্বামীজির স্বদেশ-চেতনা, বীর্যবত্তা, নিবেদিতা সকলের মনে সঞ্চারিত করে দিতেন। ডন সোসাইটির ছাত্রেরা এসে নিবেদিতার কাছে থেকে প্রেরণা নিয়ে যেতেন।

ছেলেদের নিবেদিতা চটকরে ছাড়তে চাইতেন না। বলতেন, 'ওরাই আমার প্রাণ'। ওদের দিয়েই দেশে সবকিছু গড়ে উঠবে। এই দলে ছিলেন বারীন ঘোষ। বারীন ঘোষ তখন ছাত্রদলের নেতা। দেশের কাজে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। উত্তেজনায় সবসময় তিনি টগবগ করে ফুটে চলেছেন।

বারীন ঘোষ নিবেদিতাকে বলতেন, 'ভারতের জোয়ান অব আর্ক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। আমরা তোমার সেনাবাহিনী।'

এছাড়াও আরো একটা দল ছিল। যারা আসতেন নিয়মিত। ঠাকুর বাড়ীর সুরেন্দ্রনাথ আর সরলাদেবী। সুরেন্দ্রনাথ চুপি চুপি বিপ্লবী সংস্থার সংগে যোগাযোগ রাখতেন। ওকাকুরার সঙ্গে এদেশের বিপ্লব আন্দোলনের নাড়ীর যোগ রয়েছে। ওকাকুরা যতদিন এদেশে ছিলেন নিবেদিতার সংগে তাঁর আলাপ আলোচনা প্রায় নিত্যকার ব্যাপার ছিল। নিবেদিতার বাড়ী ছিল সকলের জন্যেই উন্মুক্ত। এমন কি বিদেশ থেকে আগত মার্কিন বা ইংরেজ পর্যটক, সরকারের উঁচুপদের চাকুরে নিবেদিতার সংগে আলাপ আলোচনা করতে আসতেন নানান ব্যাপার নিয়ে।

সেই বছরের বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসনে লর্ড কার্জন বক্তৃতায় সরাসরি বল্লেন, এশিয়াবাসীরা মিথ্যেবাদী। নিবেদিতাও সেই সভায় ছিলেন। সভা শেষ হবার সংগে সংগে নিবেদিতা স্যর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়কে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে লর্ড কার্জনের 'দি প্রব্লেমস্ অব দি ইষ্ট' বই বের করে দেখালেন যে কার্জন নিজেই মিথ্যেবাদী। পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকায় এই বইয়ের উল্লেখ করে কার্জনের বক্তব্যের প্রতিবাদ

বেরুল। লর্ড কার্জন নিজেই যে মিথ্যাবাদী নিবেদিতা তা প্রমাণ করে দিলেন। দেশময় হৈ চৈ পড়ে গেল টাউন হলে হলো বিরাট সভা। ডঃ রাসবিহারী ঘোষ ছিলেন তার সভাপতি।

দেশের জননেতাদের সংগে নিবেদিতার সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল। বাংলার বাইরে যাঁরা থাকতেন তাঁরা নিয়মিত চিঠিপত্র লিখতেন নিবেদিতাকে। বাংলার নেতারা নিবেদিতার বাড়ীতেই আসতেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের চিন্তায় নিবেদিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা পাঠাতেন। কংগ্রেসের চরম পন্থী, নরম পন্থী সব নেতারাই নিবেদিতার গুণগ্রাহী ছিলেন। দু দলকেই নিবেদিতা মিলিত ভাবে দেখতে চাইতেন। কাগজের একাধিক লেখায় তিনি এমন কথাও লিখেছিলেন যে দলাদলির রাজনীতির জন্যে কংগ্রেস নয় এখানে সকলের একমন, একপ্রাণ হয়ে জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হতে হবে। এই ধরণের লেখাগুলো তাঁর স্টেট্‌সম্যান পত্রিকাতেই বেরুত।

ইদানিং যে সব সভায় নিবেদিতা বক্তৃতা দিতেন তাতে বৃটিশ বিরোধী সুর খুব উগ্র হত। তিনি চড়াগলায় বৃটিশ সরকারের নীতির সমালোচনা করতেন। ফলে সরকারে রাজদ্রোহীদের তালিকায় নিবেদিতার নাম লেখা হল। এ খবর চুপি চুপি নিবেদিতা পেয়ে গিয়েছিলেন। নিবেদিতার পেছনেও পুলিসের চর লেগেছিল। চলাফেরায় নজর রাখতো। বিশেষ করে রাখতো নিবেদিতার বাড়ীতে কারা কারা আসে। কিন্তু একদা আইরিশ বিপ্লবের নেত্রী বীরেশ্বর বিবেকানন্দের শিষ্যাকে এত সহজে দমানো যায় নি।

ডন সোসাইটীর কাজের সংগে নিবেদিতা নিজেকে জড়িয়ে দিলেন। ডন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। লিখতেন স্বদেশী আন্দোলনের কথা, জাতীয় শিক্ষার কথা, ভারতের ধর্মের কথা।

সোসাইটীর সভায় বক্তৃতাও দিতেন। তাঁর লেখায়, বলায় ছিল জাদুমন্ত্র। দেশের ছাত্ররাও যেমন উদ্বুদ্ধ হতো, দলে দলে নিবেদিতার সভায় এসে যোগ দিত, তেমনি নিবেদিতার কলমের মুন্সীয়ানায় মুগ্ধ হয়েছিলেন রমেশ দত্ত, গোখলে, তিলক, ব্রজেন শীল, স্যার রাসবিহারী, স্যার গুরুদাস, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশের নেতা ও মনীষীরা। এঁরা আগ্রহ নিয়ে নিবেদিতার বক্তব্য, মতামত পড়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন। সেকালে ডন সোসাইটিতে দেশের সমস্ত গুণীমাণী ব্যক্তিরা জড়ো হতেন। রবীন্দ্রনাথ, রমেশ চন্দ্র, ব্রজেন শীল, যদুনাথ সরকার এঁরা সবাই ডন সোসাইটির সংগে যুক্ত ছিলেন।

এই সংগে ডন সোসাইটীর মত আরেকটা সংঘ নিবেদিতা গড়ে তুললেন। বিবেকানন্দ সোসাইটি। বিবেকানন্দের মত, আদর্শ, প্রচার করার জন্যেই এই সংঘের প্রতিষ্ঠা করলেন। নিবেদিতার ইচ্ছে ছিল গুরুর নামেও মঠ প্রতিষ্ঠা। এই মঠ চালাবে সোসাইটীর সদস্যেরা। এই মঠে ছাত্রেরা বিবেকানন্দের ধ্যান ধারণার আদর্শে নিজেদের গড়ে তুলবে। বিবেকানন্দ যা লিখে গেছেন, বলে গেছেন তা নিয়ে চর্চা করবে। বছরের ছ'মাস চলবে পড়াশুনো আর বাকী ছ'মাস ভারতের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে তারা ভারতের মানুষ জন, ভারতের ধর্ম, ভারতের প্রকৃতিকে চিনতে শিখবে। রামকৃষ্ণ মিশনের তখন প্রধান ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ রাজী হলেন না। তাঁর পরিকল্পনার 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' সফল হলনা। নিবেদিতা ডন সোসাইটীতে যোগ দিলেন।

কেবল বাংলাদেশ নয় নিবেদিতার জনপ্রিয়তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সারা ভারতে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবেদিতা তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে বিস্ময়ের চমক এনে দিয়েছিলেন। সারা ভারত তাঁর ঘোরা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দেশের নানা জায়গা

থেকে তাঁর কাছে ডাক আসতো। উত্তর ভারতের মুসলমানেরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁর কাছ থেকে দেশপ্রেমের কথা, হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা শোনা চাই।

নিবেদিতা সনাতন হিন্দু ধর্মে উৎসর্গিতা হলেও তাঁর হৃদয়ের উদারতা, জাতীয়তা মুসলমান সম্প্রদায়কেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। এঁদের ডাকে নিবেদিতা উত্তর প্রদেশ, বিহার ভ্রমণ করেছিলেন। এঁদের ডাকে যেমন সাড়া দিয়েছিলেন, তেমনি এঁদের কাছ থেকে স্নেহ প্রীতির অজস্র উপহারও পেয়েছিলেন। দেখা যেত স্টেশনে স্টেশনে মুসলমান জনতা ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে। সংগে তাদের বিভিন্ন ফল ঝুড়ি ভর্তি উপহার থাকতো। কোথাও ভূর্জপত্রে লেখা প্রীতি সম্ভাষণ নিয়ে তারা অপেক্ষা করতো।

অত্যধিক খাটুনির ফলে যা হবার তাই হলো। হঠাৎ অসুখে পড়লেন। অসুখের ধরণটা সাংঘাতিক ছিল। তিরিশটা দিন ধরে জ্বরে তিনি বেহুঁশ হয়ে রইলেন। টাইফাস আর ব্রেনফিবার একসংগে। প্রাণ নিয়ে টানাটানি। বাগবাজারের বাড়ীতে ছোট ঘর, আলো-বাতাসের অভাব, আর অভাব একজন অভিভাবকের। জগদীশচন্দ্র তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীর পাশের একটা খালি বাড়ীতে।

ডাঃ নীলরতন সরকার চিকিৎসার ভার নিলেন। তিনি আসতেন ঘণ্টায় ঘণ্টায়। নিবেদিতার সেবা করার লোকের অভাব হলো না। তাঁর ছাত্রবন্ধুরা, দেশনেতারা, জগদীশচন্দ্র, গোখলে সবাই পালা করে সেবার ভার নিলেন।

রাতের পর রাত গোখলে জেগে কাটিয়েছেন নিবেদিতার সেবা করে। জগদীশচন্দ্রও কম করেন নি। এতজনের সেবা ব্যর্থ হলো না। নিবেদিতা সেরে উঠলেন। জগদীশচন্দ্র ও অবলাদেবী তাঁকে দার্জিলিঙে নিয়ে গেলেন।

জগদীশচন্দ্রের কাজে নিবেদতাকে না হলে চলতো না। যিনি ধর্মের নিষ্ঠাবতী সাধিকা, শিক্ষাব্রতী, জনপ্রিয় দেশনেত্রী তিনিই আবার জগদীশচন্দ্রের কাছে এসে বিজ্ঞানের তপস্যায় মগ্ন হয়ে গেলেন। জগদীশচন্দ্র পর্যবেক্ষণ করতেন গাছের চেতনার বিকাশ, তার স্পর্শকাতরতা, তার জন্মমৃত্যুর অপরূপ লীলা। যন্ত্রের মধ্য দিয়ে জগদীশচন্দ্র যা দেখতেন, আর অনুভব করতেন হৃদয় দিয়ে, তা একটা কাগজে খসড়ার আকারে লিখে রাখতেন। প্রতিদিন তাঁর ছিল এই কাজ। নিবেদিতা সেই খসড়ার চুম্বকটিকে নিয়ে নিজের ভাষায় গুছিয়ে বড় করে লিখে রাখতেন। এইভাবেই লেখা হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের "উদ্ভিদের সাড়া" (প্ল্যাণ্ট রেসপনস্) বইটা। দার্জিলিঙে বিরামের অবসরে নিবেদিতা এই বইটার প্রুফ দেখে সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানের কাজ শেষ হল। বিজ্ঞানী নিবেদিতা আবার স্বরূপ পাল্টে ফেললেন: সেদিন ১৯০৫ সালের ষোলই অক্টোবর। আমাদের ইতিহাসের অত্যন্ত বেদনাময় দিন। সেই দিনই চালু হয়েছে বঙ্গ ভঙ্গ আইন। দেশে যেমন বিষাদের কালো মেঘে আকাশ ঢাকা তেমনি ক্রুদ্ধ জনতার মুখর প্রতিবাদে মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশ চিরে প্রতিরোধের বিদ্যুৎ জমা হয়ে রইলো।

দেশবন্ধু তখন দার্জিলিঙে ছিলেন। দার্জিলিঙের টাউন হলে জনতার সমাবেশ হল। সভায় এলেন দেশবন্ধু আর নিবেদিতা। নিবেদিতা সেদিন ব্যথায় বেদনায় ভেঙে পড়েছিলেন। তবু দীপ্ত আবেগে জনতাকে উজ্জীবিত করে দিলেন। সভা শেষে হলো রাখি বন্ধন উৎসব। হাজার হাজার হাতে রাখি বাঁধা হলো।

নিবেদিতা বললেন, যতদিন না এই বাংলার বুক থেকে বিভেদের প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হবে ততদিন এ সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যাবই।

নিবেদিতা ক'লকাতায় ছুটে এলেন। সে সময় গোখলে ছিলেন লণ্ডনে। লণ্ডন থেকে তিনিও ফিরে আসছেন এই দুঃসংবাদ পেয়ে। কাশীতে হবে কংগ্রেসের অধিবেশন। নিবেদিতা কাশীতে চলে এলেন। গোখলে হবেন কংগ্রেস সভাপতি। জনতা অদ্ভুত উত্তেজনায় গোখলের প্রতীক্ষায় রইলেন। দেশে এসেছে নব জাগরণের সাড়া। সরকারের অন্যায়ের কর্মে জনতার চ্যালেঞ্জ রইলো। গোখলেকে সামনে রেখে সেনাপতি নির্বাচন করে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। এই তখন দেশের অবস্থা।

ঠিক হলো গোখলেকে জনতার সামনে বরণ করে নেওয়া হবে। স্টেশনে হাজার হাজার জনতার ভীড়। মহামতি গোখলে স্টেশন থেকে নেমে আসতেই সকলের প্রতিনিধি হয়ে নিবেদিতা এগিয়ে এলেন। তিনিই হলেন উপযুক্ত সাধিকা যিনি দেশনেতাকে বরণ করে নেবেন। নিবেদিতা গোখলের মুখোমুখি হয়ে দু হাত দিয়ে তুলে ধরলেন তার সামনে একপাত্র দুধ। সেই দুধ বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ। তারপর গলায় তুলে দিলেন সোনালী জরি দিয়ে গাঁথা ফুলের মালা।

জনতা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলো। দেশমাতার জয়ধ্বনি, গোখলে আর নিবেদিতার জয়ধ্বনি। শোভাযাত্রা চলতে লাগলো বিপুল উৎসাহে, দেশনেতাকে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চাপিয়ে। সেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের মধ্যে হঠাৎ আরো তীব্র আবেগের সঞ্চার হলো। জনতা গোখলের গাড়ীর ঘোড়া খুলে দিল। সবাই মিলে বুক দিয়ে টেনে নিয়ে চললো সেই রথ।

কাশীর পথে পথে সেদিন উৎসবের সাজ। স্বদেশী জিনিষের মেলা বসেছে। রঙীন হয়ে উঠেছে শহরের পরিবেশ। চারিদিকে ফুটছে রং বেরংয়ের কাগজের মালা, ফুল আর নিশান। জনতার প্রতিবাদের আনন্দ আর যুদ্ধের উন্মাদনা মিশে এক হয়ে গেছে। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা সভামঞ্চে এসে পৌঁছালো।

সভা শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথ উঠে গাইলেন বন্দেমাতরম্। তারপর গোখলে উঠে দাঁড়ালেন তাঁর বক্তৃতার তরবারি নিয়ে।

সেই অধিবেশনে সব নেতারাই জড়ো হয়েছিলেন। তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল, রমেশ দত্ত, চরমপন্থী, নরমপন্থী। সবাই এসে মিলিত হলেন। সভার অধিবেশনে নিবেদিতা যোগ দিতেন না। কিন্তু সভায় যাওয়ার আগে প্রতিদিন তাঁর বাড়ীতে আগের সন্ধ্যায় নেতাদের বৈঠক বসতো। নিবেদিতার লক্ষ্য ছিল একযোগে কাজ করা। কংগ্রেস বিভেদের প্রতিষ্ঠান নয়। এখানে সব মত মিলিত হবে কেননা সারা দেশের লক্ষ্যপথ একটাই। নিবেদিতার মতামত নিয়ে তৈরী হত যে সিদ্ধান্ত, পরের দিন সভায় তা নিয়েই আলোচনা হত। বক্তৃতা চলতো।

অনেকের ভাষণ অধিবেশনে পঠিত হবার আগে নিবেদিতাকেই তা দেখে দিতে হত। নিবেদিতা তত্ত্ব দিয়ে তথ্য দিয়ে সেই সব বক্তৃতা সাজিয়ে দিতেন।

সন্ধ্যাবেলায় নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসতেন। সকাল বেলায় বিভিন্ন খসড়া প্রস্তাব আর ভাষণ-এর পরিমার্জনা করে দিতেন। দুপুরে লিখতেন সভার বিবরণ। সেই বিবরণ খবর হয়ে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় বেরুত। র‍্যাটক্লিফ সাহেব তখন স্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদক। নিবেদিতা লিখতেন 'অ্যান ইংলিশ অবজারভার'—এই ছদ্মনাম নিয়ে। অবশ্য এই সব লেখায় স্বাভাবিক কারণেই উগ্র সুর খুব বেশী থাকতো না। কিন্তু থাকতো কাজের কথা, কেমন ভাবে চললে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ দূর হবে? কংগ্রেস আন্দোলনের দুর্বলতা কোথায়? এই সবের উপরই জোর দিতেন। বৃটিশ বিরোধী সুর চড়া গলায় প্রকাশ করতেন না।

কাশী কংগ্রেসে বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভারত-লক্ষ্মীর রূপ ধারণ করলেন।

কাশী কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা আর একটা নতুন

কাজে হাত দিলেন। তখন দেশে বিদেশী জিনিষ বয়কটের জোর আন্দোলন চলেছে। স্বদেশী শিল্প বাণিজ্যের প্রসার না ঘটলে দেশ স্বাবলম্বী হবেনা। বিলেতী জিনিসের প্রতি আকর্ষণ নিবেদিতার চলে গেল। ভারতবর্ষকেই তিনি স্বদেশ করে নিয়েছেন। এদেশের সামান্য শিল্প-কার্য নিবেদিতার পরম আদরের জিনিস হয়ে উঠলো।

ডন সোসাইটির ছেলেদের তিনি উৎসাহিত করলেন। নিবেদিতার প্রেরণায় তারা স্বদেশী জিনিসের এক দোকান খুললো। জাতীয় সমবায় সমিতিগুলোর মধ্য দিয়ে দেশী কারিগরদের টাকা ধার দিয়ে—কাঁচামালের নিয়মিত যোগানের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিবেদিতা স্বদেশী শিল্প গড়ে তোলার কাজে মনোযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে বারীন ঘোষ তাঁর অনেকখানি সহায়ক ছিলেন। বারীন ঘোষ শহর আর মফস্বলের মধ্যে মালপত্র আদান ও লেনদেনের দেখাশুনা করতেন।

তাঁরই প্রেরণায় একদল ছেলে গিয়ে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছোট ছোট জিনিস তৈরী করার শিক্ষা নিয়ে এল। যুরোপ আমেরিকায় বন্ধুদের এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে লিখে পাঠালেন। মিসেস বুল শিল্প-শিক্ষার জন্যে তোলা ম্যাজিক লণ্ঠন পাঠিয়ে দিলেন। মিস ম্যাকলয়েড ছোটখাট শিল্প সম্বন্ধে নানা জনের বই জোগাড় করে নিবেদিতার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে নিবেদিতা দুবার স্বদেশী মেলার আয়োজন করেছিলেন।

১৯০৭ সালের আগষ্ট মাসে নিবেদিতা আবার তাঁর জন্মভূমির উদ্দেশ্যে ভাসলেন। আগের বার ১৮৯৯ সালে, যখন তিনি পশ্চিমের দেশগুলি দেখতে বেরিয়েছিলেন তখন স্বামীজী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জাহাজে গুরুদেবের সঙ্গে কত বিষয় তিনি আলোচনা

করেছিলেন। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম কত ব্যাপারে কত কিছুই না তিনি শিখেছিলেন। এবার তিনি একা।

কিছুদিন আগে থেকেই নানা কারণে নিবেদিতার শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। ১৯০৫ সালে তাঁর কঠিন টাইফয়েড হল। পরের বছর শেষের দিকে পড়লেন শক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে। জ্বরের আগে গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। সেখানে বন্যায় কষ্টে পড়া মানুষদের তিনি মায়ের মতো সেবা করেন। এক একটা বন্যায়—দুর্ভিক্ষে অসহায় মানুষ কতই না কষ্ট পায়। মুখে ভাত নেই। পরনে কাপড় নেই। চারিদিকে কেবল দুঃখ আর কান্না। মানুষের এই অসহায় অবস্থা দেখে নিবেদিতা মনে বড় ব্যথা পেয়েছিলেন। এই বছরের জুলাই মাসে আর একটি শোক তিনি সামলেছেন। তাঁর প্রিয় গোপালের মা মারা গেছেন।

এছাড়া দেশের চারিদিকে তখন নানা অশান্তি আর ভয়ানক গণ্ডগোল চলেছে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হয়েছে। নিবেদিতাও দিন দিন দেশের নানা কাজে বড্ডো জড়িয়ে পড়ছিলেন। অথচ তাঁর অসুস্থ শরীরে এত পরিশ্রম সহ্য হচ্ছিল না। তাঁর বন্ধু, বান্ধবী—যারাই তাঁকে ভালোবাসেন, বললেন,—কিছুদিন তিনি পশ্চিমের দেশগুলি ঘুরে আসুন। এতে বিশ্রাম হবে। শরীর ও মন ভালো হয়ে উঠবে।

নিবেদিতা কথাটা ভালোই বলে মনে করলেন। ভগিনী কৃস্টীন, বিদ্যালয়ের ভার নিজের ওপর নিলেন। নিবেদিতার বিদেশ যাওয়ার আয়োজন সম্পূর্ণ হলো।

১৯০৭ সাল এবার সেপ্টেম্বর মাসে নিবেদিতা লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন।

দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে আবার তিনি এদেশে এলেন। মা, ভাই, বোনের সঙ্গে দেখা হল। কি আনন্দ। মা-মেরী অবাক হয়ে কন্যা

মার্গারেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবলেন কন্যার জীবনের ভবিষ্যত-বাণী কেমন সুন্দর মিলে গেল। দূর দেশ থেকে বড়ো কাজের যে ডাক এল; তারই জন্যে মা, ভাই, বোন, দেশের সব কিছুই পেছনে রেখে সে চলে গেল।

মার্গারেটও আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের দেবার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে কত নতুন নতুন জিনিস এনেছে। মাটির প্রদীপ, ধূপ, ধূপদানী, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি দেবতার পট। নানা রকমের মালা, পাথরের নুড়ি। এমনি দেখলে জিনিসগুলি সামান্যই মনে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষকে কত ভালোবাসেন নিবেদিতা। ভারতের প্রতিটি জিনিস তাঁর কাছে আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়। এমনকি একটা বোতলে করে গঙ্গাজলও এনেছেন। মার সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধে কত কথা হয় নিবেদিতার। মা মুগ্ধ হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর তার কথা শোনেন।

ইংলণ্ডে কয়েকদিন থেকে নিবেদিতা য়ুরোপে এলেন। এখানে ভারত থেকে য়ুরোপে এসেছেন জগদীশচন্দ্র ও অবলা বসু। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক চিন্তা য়ুরোপ, আমেরিকায় সাড়া জাগিয়েছিল। নিবেদিতার প্রত্যক্ষ প্রেরণাতেই তাঁর 'উদ্ভিদের সাড়া' বইটা বেরোলে, দেশে বিদেশে বিজ্ঞানীরা এর খুব প্রশংসা করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণা বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমন্ত্রণ পেলেন।

পুরোনো বছর গিয়ে এল নতুন বছর। এখন উনিশ শো আট। বিশ্রাম করতে এসেছিলেন কিন্তু কাজে মেতে উঠলেন নিবেদিতা। ভারত ছেড়ে এসেছেন। কিন্তু সেই প্রাণের দেশকে এক মুহূর্ত ভুলতে পারতেন না।

তিন রকমের কাজ আরম্ভ করলেন তিনি। লেখা, বক্তৃতা, আলোচনা। তাঁর সব কাজেরই শেষ লক্ষ্য ছিল ভারতের সেবা। ভারতের জীবনকথাকে এদেশের লোকেদের কাছে পরিচিত

করে তুলতে চান। লণ্ডনের বিভিন্ন আলোচনা কেন্দ্রে তিনি ভারতের বেদ, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। জগদীশচন্দ্র যাতে এদেশে সম্মানিত হন—ভারতের গৌরব যাতে বাড়বে—এর জন্য নিবেদিতা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

ইংলণ্ডের অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সঙ্গে—সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ হয়ে গেল। নিবেদিতা ঠিক করলেন ভারতবাসীর নানা সমস্যার কথা ও ভারতে ইংরেজ শাসনের কঠোরতার বিষয় নিয়ে এখানকার কাগজে তিনি লিখবেন। ভারতবাসীর জন্যে এদেশের শিক্ষিত লোকের সহানুভূতি তিনি চান।

এই সময় বিভিন্ন পত্রে বেরোল নিবেদিতার কয়েকটা লেখা—ভারতীয় নারী, ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় সমস্যা প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধ। ইংলণ্ডের লোক বহুদূর ভারতের কথাও ভাবতে লাগলো।

সেপ্টেম্বর মাসে নিবেদিতা গেলেন আয়ার্ল্যাণ্ডে। উঠলেন মায়ের বাড়ীতে। নিবেদিতার সঙ্গে রয়েছেন জগদীশচন্দ্র। কতদিন পরে তিনি জন্মভূমিতে এলেন। ছোট্ট মার্গারেটের শৈশবের কথা তাঁর মনে পড়ল। এই আয়ার্ল্যাণ্ডেই একসময় তিনি স্বদেশ সেবার মন্ত্র নিয়েছিলেন। এখন ভারতবর্ষই তাঁর জন্মভূমি। কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের মাটী এক নিমেষেই তাঁর মনটিকে নিজের কাছে টেনে নিল।

একমাস এখানে থেকে নিবেদিতা আমেরিকায় গেলেন। এবার রইলেন বিবেকানন্দ শিষ্যা ওলে বুলের কাছে। এখানে আরো অনেক পরিচিতা মহিলার সঙ্গে দেখা হল। মিস এমা থার্সবি, মাদাম কালর্ভে, মিস ফামার এরা সকলেই নিবেদিতার সঙ্গে দেখাশুনায় খুশী হলেন।

নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসটা নিবেদিতার বক্তৃতা করেই কাটল। পিটস্‌বার্গ, ফিলাডেলফিয়া নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বাল্টিমোর

প্রভৃতি আমেরিকার নানা জায়গা থেকে বক্তৃতা করবার ডাক এল। নিবেদিতা ঘুরে ঘুরে অনেক বক্তৃতা দিলেন। এর বদলে কিছু টাকাও তাঁর হাতে এল। বিদ্যালয়ের কাজে—বিদ্যালয়ের জন্য যা তিনি খরচ করবেন।

ইংলণ্ড, আমেরিকায় ঘুরে বেড়ালেও নিবেদিতার মন পড়ে থাকে ভারতের মাটিতে। ভারতে এ সময়ে দারুণ অবস্থা। দেশের যুবকেরা রুখে দাঁড়িয়েছে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। বিদেশীর শাসন কিছুতেই তারা মানবে না। ইংরেজ সরকার যা বারণ করে, সেটাই তাদের আগে করা যাই। দূর বিদেশে ভারতের ছেলেদের কষ্ট, নির্যাতনের কথা তিনি শোনেন। দেশে ফিরে আসার জন্য তাঁর মন ছটফট করে।

নিবেদিতা ঠিক করলেন জগদীশচন্দ্র বসুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলেই ভারতে ফিরবেন।

নিবেদিতা যখন আমেরিকায় ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাস তখন ইংলণ্ড থেকে খবর এল তাঁর মা মৃত্যুশয্যায়। খবর পেয়েই নিবেদিতা ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। পীড়িতা মা'র শিয়রে এসে বসলেন।

মেয়েকে দেখে মা'র মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তিনি শান্তিতে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। ক্রমে মা'র অবস্থা আরো খারাপ হয়ে উঠতে লাগলো। শেষ মুহূর্তে নিবেদিতা ঘরের জানালা খুলে দিলেন।

মা'র বিছানার কাছে একগুচ্ছ ফুল রাখা হলো। বাতির আলোয় ধূপের গন্ধে ঘর ভরে উঠল। মা'র দিকে চেয়ে নিবেদিতা চুপ করে বসে রইলেন।

মা'র মৃত্যুর পর নিবেদিতা কিছুদিন ভাইবোনেদের সঙ্গে কাটালেন। কে জানে আর কি তিনি এদের মধ্যে ফিরে আসতে পারবেন।

মার্চ মাসে জগদীশচন্দ্র তাঁর আমেরিকার বক্তৃতা সেরে ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। ২রা জুলাই মার্সেলিস থেকে জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা ভারতগামী জাহাজে উঠলেন। দীর্ঘ দুবছরের পর নিবেদিতা তাঁর অতি প্রিয় বাগবাজারের বাড়ীতে পা দিলেন।

নিবেদিতার ব্যক্তিত্ব, তাঁর কর্মশক্তি, তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা যেই পড়ুক বা আলোচনা করুক, সেই বিস্ময়ে অবাক না হয়ে পারবে না। একজন মানুষের মধ্যে এত প্রাণশক্তি—এত কাজ করবার ক্ষমতা কোথা থেকে এল।

ভারতের জাতীয় জীবনে এমন কোন দিক নেই যে দিক নিয়ে চিন্তা তিনি না করেছেন। দেশ বিদেশের কত মনীষীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছে। আর সব সময়েই তিনি নিজের ভাবনা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে নিজের মতে টেনে এনেছেন। তাঁর সঙ্গে যে সব নানা ব্যক্তির পরিচয় হয়েছে, তাঁদের কয়েকজনের কথা আলোচনা করলে জানা যাবে কি প্রবল ছিল তার প্রতিভা। বোঝা যাবে কি গভীর ছিল তাঁর দেশের প্রতি ভক্তি।

কাজের জন্য কত লোকের কাছে তিনি গেছেন। কত লোকে তাঁর কাছে এসেছেন। সকলের সঙ্গেই যে তাঁর মতের মিল হয়েছে তা নয়। নিবেদিতা স্পষ্ট করেই মতের অমিলের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে সকলেই তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে উঠত। যিনি দেশকে ভালোবাসেন, ভারতবাসীর ভালো করতে চান, নিবেদিতা তাঁর চিরদিনের বন্ধু। প্রাণপণে নিবেদিতা তখন তাঁকে সব ব্যাপারে সাহায্য করেন।

ভারতকে নিবেদিতা যে কত ভালবাসতেন তাঁর পরিচিত

কয়েকজনের কাজের ধারা থেকে খুব সুন্দর তা বুঝতে পারা যায়।

ভারত পরাধীন। ভারতের বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রকে দেশ বিদেশে পরিচিত করা দরকার। এতে বিশ্বের কাছে ভারতবাসীর গৌরব বাড়বে।

নিবেদিতার কি আশ্চর্য মনীষা! জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানের তত্ত্বকে তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে সাহায্য করলেন। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে চললেন। অর্থাভাবে বা অন্য কারণে যদি কখনো জগদীশচন্দ্র একটু হতাশ হয়ে পড়তেন, নিবেদিতা তখন তাঁকে কতভাবে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন। জগদীশচন্দ্র নিজের দরকারে অনেক সময়-ই নিবেদিতার বাড়ী যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের আলাপ আলোচনায় কেটে যেত। জগদীশচন্দ্র আমাদের দেশের বড়ো বৈজ্ঞানিক বলে আজ আমরা গর্ব অনুভব করি। কিন্তু তাঁর এই প্রতিভার বিকাশের পেছনে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে গেছেন।

নিবেদিতা চেয়েছিলেন ভারতীয় ছাত্রদের জন্য বিজ্ঞান মন্দির হোক। যেখানে দেশের ছেলেরা বিজ্ঞানের চর্চা করবে। ভারতবাসী এতে টাকাকড়ি দেবে। তারাই এটা পরিচালনা করবে। জগদীশচন্দ্র যে দিন বসু-বিজ্ঞান-মন্দির খুললেন, নিবেদিতা সেদিন আর এই পৃথিবীতে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর একটা ইচ্ছাই সেদিন পূর্ণ হল।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দরজার পাশে দেওয়ালের গায়ে দীপ হাতে নারীর যে মূর্তি আছে তা আমাদের নিবেদিতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। নিবেদিতার সাহায্য জগদীশচন্দ্র কোনদিন ভোলেননি। মৃত্যুর আগে তিনি উইলে নিবেদিতার নামে এক লক্ষ টাকা রেখে যান। এই টাকা দিয়ে অবলা বসু পরে তাঁর বিদ্যালয়ে 'নিবেদিতা হল' তৈরী করান।

প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দবাবু জগদীশচন্দ্রের কাছ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ চেয়েছিলেন তাঁর মডার্ন রিভিউ পত্রিকার জন্যে। জগদীশচন্দ্র তখন নিবেদিতাকে তাঁর হয়ে লিখতে বলেন। নিবেদিতা লিখবেন বলে কথা দিলেন।

মডার্ন রিভিউ পত্রিকার প্রকাশকাল থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিবেদিতা এতে লেখা পাঠিয়েছেন। এই পত্রিকায় নানা বিষয়ে তিনি লিখতেন। রাজনীতি, শিক্ষা, শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতেন। কখন বা পত্রিকাটি সম্পাদনা করতে রামানন্দকে সাহায্য করতেন। এই পত্রিকার উন্নতির জন্যেও নিবেদিতার সজাগ দৃষ্টি ছিল। কারণ এটি ছিল এমন একটি পত্রিকা যাতে দেশের কথা বিশেষ ভাবে চিন্তা করা হোত। দেশ সেবাই ছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের ব্রত। আর এই দিক দিয়ে নিবেদিতার স্বভাবের সঙ্গে রামানন্দের গভীর মিল ছিল।

বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে নিবেদিতার মতের অমিলই ছিল। বিপিনচন্দ্র ছিলেন ব্রাহ্ম। নিবেদিতা, বিবেকানন্দ শিষ্যা। প্রায়ই ধর্ম নিয়ে তাঁদের মধ্যে জোর তর্ক বিতর্ক চলত। কেউ হার মানত চাইতেন না। কিন্তু একবার বোস্টনের এক ধর্মসভায় বিপিনচন্দ্র যখন ভারতের ধর্মের জয়গান করলেন নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের ভাব দূর হয়ে গেল। ভারতে ফিরে বিপিনচন্দ্র 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন। নিবেদিতা তাতে নিয়মিত লিখতেন।

ভারতের গৌরব বাড়ানোর জন্য যিনি যেভাবে চেষ্টা করেছেন ; নিবেদিতা তাকে সেইভাবে সাহায্য করেছেন। যদুনাথ সরকার তখন সবে ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করে খ্যাতিলাভ করেছেন। নিবেদিতা তাঁকে বলেছিলেন—বিদেশীর কাছে আপনার পতাকা

কখনও নীচু করবেন না। ঐতিহাসিকদের আত্মবিশ্বাস চাই। দেশের সত্য ইতিহাস তাঁরাই তো লিখবেন। যদুনাথ সরকার আমাদের দেশের একজন বড়ো ঐতিহাসিক। আর নিবেদিতার উপদেশ নিজের সারা জীবনে কোন দিন তিনি ভোলেন নি।

দীনেশচন্দ্র সেন নিবেদিতার কাছে এসেছিলেন। দীনেশচন্দ্র ইংরেজীতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। দীনেশচন্দ্রের কাজ নতুন ধরনের ছিল। আর এজন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রমও করেছিলেন। তিনি এই বড়ো বইটার সবটা নিবেদিতাকে দেখে দিতে অনুরোধ করলেন। নিবেদিতা সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। যদিও দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর রাজনীতি ব্যাপারে মতবিরোধ ছিল।

ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে নিবেদিতার আগ্রহ ছিল গভীর। আমরা জানি কত মমতা নিয়ে তিনি প্রাচীন ভারতের মন্দির, স্তূপ ইত্যাদি দেখতেন। নিবেদিতা চাইতেন আমাদের এই মন্দির স্তম্ভ স্তূপ গুলির গায়ে যে মূর্তি আঁকা রয়েছে, যে চিত্র খোদাই করা আছে, ভারতের শিল্পীরা সেইগুলির আদর্শেই ছবি আঁকবেন। আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারতে যে জীবনের কথা বলা হয়েছে, দেশের শিল্পীরা সেই জীবনকথা নিয়ে ছবি আঁকবেন, মূর্তি গড়বেন। তাহলে আমাদের শিল্পীদের আঁকা চিত্রের সংগে, মূর্তির সংগে দেশের মনের যোগ থাকবে।

কিন্তু তখনকার দিনের চিত্রকর বা শিল্পীরা ঠিক উল্টো আদর্শই অনুসরণ করে চলছিলেন। বিদেশী ধারা অনুকরণ করেই আমাদের দেশের শিল্পীরা তাদের শিল্পকলা সৃষ্টি করত। নিবেদিতা দেখলেন শুধু পরের এই অনুকরণ করে কোন বড় কাজই করা যায় না। ভারতীয় শিল্পীদের মতও কাজের ধারা বদলাবার চেষ্টা সুরু করলেন তিনি।

তখন আমাদের দেশে যে আর্টস্কুল বা ছবি আঁকা শেখার

বিদ্যালয় ছিল, তার অধ্যক্ষ ছিলেন হ্যাভেল সাহেব। হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় ছিল। নিবেদিতা হ্যাভেলকে বললেন নিজের মনের কথা। আলাপ আলোচনা করে তাঁকে নিজের মতে নিয়ে এলেন নিবেদিতা। সাহেব আমাদের দেশের শিল্পের মূল্য বুঝলেন। তিনি ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে একটা বই লিখলেন। এর ফলে বিদেশী বড়ো বড়ো শিল্পী শিল্প সমালোচকদের দৃষ্টি আমাদের শিল্পের ওপর পড়ল।

নিবেদিতার কত কাজ। তিনি ভারতের শিল্প নিয়ে আর্টস্কুলে বক্তৃতা দিলেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথকে নিজের দলে তো এনেছিলেন। এবার তাঁর ছাত্রদের ও তিনি এই ব্যাপারে উৎসাহী করে তুললেন।

বিদেশ থেকে বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ভালো ভালো ছবি জোগাড় করে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে পাঠিয়ে দিতেন। আবার দেশীয় আদর্শে যখন অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যরা ছবি আঁকতেন তাও তিনি মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। শিল্প সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি এখানে নিয়মিত লিখেছিলেন।

১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে মিসেস হেরিংহ্যাম ভারতে এলেন। তিনি অজন্তার চিত্রগুলি নকল করাবেন। তাঁর কয়েকজন শিল্পীর দরকার। শোনামাত্রই নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথকে ধরলেন। নন্দলাল বসু, অসিত হালদারকে পাঠাতে হবে। তিনি মিসেস হেরিংহ্যামকেও চিঠি পাঠালেন। হেরিংহ্যাম জবাব দিলেন শিল্পী তিনি এনেছেন বোম্বাই থেকে। আর শিল্পীর দরকার নেই।

কিন্তু অজন্তার মূর্তিগুলি ভাল করে দেখলে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা নতুন জিনিষ শিখবেন। নিবেদিতা আবার চিঠি লিখলেন সেই বিদেশিনী মহিলাকে। এদিকে নন্দলাল বসুরও বাইরে

যাবার বেশী ইচ্ছে ছিলনা। কিন্তু নিবেদিতা তাঁকেও উৎসাহিত করে পাঠালেন। তারপর বড় দিনের ছুটিতে, ডিসেম্বর মাসে জগদীশচন্দ্রকে নিয়ে নিজেও গিয়েছিলেন অজন্তা, ইলোরার গুহাগুলি দেখতে। নন্দলাল বসুরা তিনমাস থেকে অজন্তার বহু মূর্তি, শিল্পের অনুসরণ করে ছবি তৈরী করলেন। তাঁদের এই কাজ দেশীয় ধারায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় নব জাগরণের সাড়া এনেছিল।

ঘুমিয়ে পড়া ভারতীয় শিল্প আবার নতুন করে জেগে উঠল। আমাদের দেশীয় শিল্পের এই নব জাগরণে নিবেদিতার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

নিবেদিতার ছিল দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। যিনিই তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, তিনিই একথা সহজেই মেনে নিয়েছেন। নিবেদিতা এক আশ্চর্য স্বভাব ও শক্তির অধিকারিণী। এই খবর বড়লাট লর্ড মিন্টোর পত্নী লেডি মিন্টোর কানেও পৌঁছেছিল। তিনি শুনেছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা দেশ জাতি ছেড়ে ভারতকেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছেন। নিবেদিতার কাজের প্রশংসা শুধু ভারতে নয় বিদেশেও শুনেছিলেন। লেডি মিন্টোর কৌতূহল হল। তিনি নিবেদিতার সঙ্গে আলাপ করবেন।

এটা ১৯১০ সালের ঘটনা। তখন মিন্টো ভারতের বড়লাট। সারা দেশ জুড়ে ইংরেজ বিদ্বেষ চলেছে। ধরপাকড়, বাদ প্রতিবাদে ভারতবাসী ও বিদেশী শাসক সকলেরই মন উত্তেজনাময়। এই পরিবেশে লেডি মিন্টো চললেন নিবেদিতার কাছে। দেখবেন তিনি, কেমন করে নিজের ধর্ম ছেড়ে, এই আদর্শবাদী মেয়েটি ভারতের কাজে, হিন্দুধর্মের মধ্যে নিজের প্রাণের শান্তি খুঁজে পেয়েছে। লেডি মিন্টো মিসেস ফিলিপসন নামে একজন আমেরিকান মহিলা এবং ভিক্টর ব্রুক নামে একজন পুরুষ সঙ্গী নিয়ে নিবেদিতার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন নিজের

পরিচয় গোপন রেখে সাধারণ একজন বিদেশী মহিলার মতো নিবেদিতার স্কুল দেখতে।

নিবেদিতা তাঁকে,সব কিছু দেখালেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সম্বন্ধে বললেন। নিবেদিতা লেডি মিণ্টোকে আরো বললেন, বাগবাজারে তাঁর প্রতিবেশীরা যদিও দরিদ্র ; কিন্তু নিজেদের সম্পর্কে তারা খুব গর্বিত। তারপর হিন্দুধর্ম ও দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আলোচনা করলেন। বড়লাটের পত্নী বুঝলেন এ বিষয়ে নিবেদিতার কি গভীর পড়াশুনা রয়েছে। তেমনি গভীর তাঁর ভারত প্রেম।

ফিরে আসবার সময় লেডি মিণ্টো নিজের পরিচয় দিলেন। নিবেদিতা অবাক হয়ে গেলেন। নিবেদিতার বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী লেডি মিণ্টোর মনে দাগ কেটে দিল। তিনি নিবেদিতার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন। ঠিক হলো কয়েকদিন পরে নিবেদিতা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেবের মন্দির দেখতে নিয়ে যাবেন।

নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা দক্ষিণেশ্বর গেলেন। লেডি মিণ্টোর সঙ্গে মাত্র ভিক্টর ক্রক। নিবেদিতার সঙ্গে এসেছেন সিষ্টার কৃস্টীন। তাঁরা একটা ভাড়া করা মোটরে নিবেদিতাকে তুলে নিয়ে মন্দিরে এসে পৌঁছলেন। মন্দিরের ভাবময় পরিবেশ লেডী মিণ্টোকে মুগ্ধ করল। তিনি রামকৃষ্ণদেবের শয়নকক্ষ দেখলেন।

অবশেষে ফেরা হলো। নৌকোয় চড়া বড়লাটপত্নীর জীবনে এক অভিনব ঘটনা। তিনি লঞ্চে করে যখন নদীপথে যাতায়াত করেছেন তখন ঘাটের নরনারীর ভিড়, স্নানার্থী সবই দেখেছেন। কিন্তু এখন নৌকো করে যখন তিনি ঘাটের পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন তখন ব্যাপারটা তাঁর বেশ উপভোগ্য লাগল। ভাবতেও পারেননি যে কখনও নৌকায় উঠবেন। নিবেদিতা তাঁকে চা দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। নানা বিষয়ের আলোচনা হল। নিবেদিতার দরদী কণ্ঠের কবিতা আবৃত্তির মধ্যে একটি মনোরম সন্ধ্যা কাটালেন লেডি মিণ্টো।

বড়লাট পত্নীর সঙ্গে পরিচয়ে নিবেদিতার স্বভাবের আর একটি দিক সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছিল। লাট সাহেবের পত্নীর অভ্যর্থনা অথচ কোন অধিক ব্যস্ততা নেই। অকারণ হৈ চৈ নেই। শান্ত, স্নিগ্ধভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন নিবেদিতা। সহজ অতিথি-পরায়ণতা আর অবিচল মর্যদাবোধ তাঁর চরিত্রের দুটি দিক এখানে সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে যে নিবেদিতাকে আমরা জানতে পারি তিনি কর্মী নিবেদিতা। দেশনেত্রী নিবেদিতা তিনি দেশের সাহিত্যে অনুরাগিণী। দেশের শিল্পে অনুরাগিণী। বিজ্ঞানের উপাসিকা। রাজনীতির প্রয়োজনে হোক, বন্যায় দুর্ভিক্ষে আর্তত্রাণের জন্য হোক, কিংবা শিল্পের বা পুরাকীর্তির আকর্ষণেই হোক নিবেদিতা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সকল কাজের মধ্যে তিনি লুকিয়ে রয়েছেন প্রেরণা হয়ে। বৃহৎ জাতীয়তার আগুন জ্বালাতে তিনি হয়েছেন আগুনের ছোট্ট একটি ফুলকি। তাঁকে চাই সকলের আগে।

কিন্তু নিবেদিতার সঙ্গে যখন সারদা মার দেখা হয়? এক মুহূর্তে চলে যায় তাঁর সকল কর্মব্যস্ততা। তাঁর দৃঢ় চরিত্র, জ্ঞান বিচারবুদ্ধি, পরিচালনাশক্তি নিমেষেই দূর হয়ে যায়। তাঁর প্রতিভা তেজস্বিতা, বুদ্ধিদীপ্তি লুকিয়ে পড়ে। যেন একটি পাঁচ বছরের মেয়ে শ্রীমার কাছে এসে বসে। মাকে ছাড়া আর যে কাউকে জানে না মার ওপরই যে সমস্ত সময় নির্ভর করতে চায়। সারদা মা নিবেদিতাকে বলতেন খুকি। সত্যিই খুকি তিনি হয়ে যেতেন শ্রীমার শান্ত, আনন্দময় সান্নিধ্যে এসে।

সারদাদেবী মাঝে মাঝে বাগবাজারে 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে থাকতেন। শ্রীমা এসেছেন জানলে নিবেদিতা তাঁর শত কাজ ফেলে ভগিনী ক্রস্টীনকে নিয়ে একবার করে মাকে দেখে আসতেন।

চুপ করে তাঁর পাশে বসে থাকতেন। কোন কোনদিন সন্ধ্যেবেলা মার পাশে বসেই ধ্যান করতেন। মা'র মনের শান্তি, ভক্তি, ধর্মভাব, নিবেদিতার মনকেও স্পর্শ করে যেত। শ্রীমা তাঁর দিকে চেয়ে একটু হাসলে নিবেদিতা বালিকার মতো আনন্দে গলে যেতেন। যেদিন তিনি শ্রীমার বসার আসনখানি পেতে দিতে পারতেন, সেদিন আহ্লাদের শেষ থাকতো না। তিনি আসনটি বারবার চুমু খেয়ে, অতি যত্নে ধুলো ঝেড়ে তবে পাততেন।

শ্রীমার সঙ্গে প্রথমদিন দেখা হওয়া মাত্রই নিবেদিতা তাঁর মধ্যে অফুরন্ত স্নেহের সন্ধান পেয়েছিলেন। পরে যখন রাজনীতি চর্চার জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশন ছেড়ে এসেছিলেন তখনও কিন্তু শ্রীমার সঙ্গে তাঁর মধুর ভালোবাসার সম্পর্ক কোনদিন এতটুকু মলিন হয় নি।

শ্রীমাকে কত জিনিসই না তাঁর দিতে ইচ্ছে করত। একবার তিনি শ্রীমাকে একটি জার্মান সিলভারের কৌটো দিয়েছিলেন। তাতে সারদাদেবী রামকৃষ্ণদেবের চুল রাখতেন। বলেছিলেন পূজোর সময় কৌটোটা দেখলে নিবেদিতার কথা মনে পড়ে। আবার শ্রীমাও নিবেদিতাকে একটি ছোট পশমের পাখা তৈরী করে দিয়েছিলেন। পাখা হাতে নিয়ে নিবেদিতার কি আনন্দ! একবার মাথায় ঠেকান। একবার বুকে জড়িয়ে ধরেন। নিবেদিতা যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা, হিন্দুধর্মপ্রাণা; তাঁর সেই নম্র উপাসিকা মূর্তিটি উজ্জ্বল হয়ে উঠে যখনই তিনি এসে বসেছেন শ্রীমার পাশে।

১৯০৯ সালে নিবেদিতা যখন ফিরে এলেন তখন দেশে বিপ্লবীদের অবস্থা সংকটময়। বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে। অরবিন্দ একবছরের জন্য কারাবাস লাভ করেছেন। তিলক, কৃষ্ণকুমার মিত্রও কারাবাসে। নিবেদিতার পরিচিত বন্ধুজন প্রায় কারুরই দেখা পান না। সবদিকেই ছন্নছাড়া অবস্থা।

রামকৃষ্ণ মিশনের অবস্থাও সঙ্গীন। পুলিশের দৃষ্টি মঠের সাধুদের ওপর গিয়ে পড়েছে। সারা দেশের ওপর শাসনের দণ্ড উদ্যত হয়ে রয়েছে।

নিবেদিতা দেখলেন, জেল থেকে ফেরার পর অরবিন্দ কত বদলে গেছেন। জেলে যাবার আগে তিনি দেশের বিপ্লবী তরুণদের, সন্ত্রাসবাদী যুবকদের পথপ্রদর্শক ছিলেন। তাদের সব কাজের প্রেরণা হয়ে ছিলেন। কিন্তু কারাগারে এসে তাঁর ঈশ্বরে অপরিসীম বিশ্বাস জন্মাল। অনুভব করলেন এই বিশ্বের সকল কার্য কারণের মূলে রয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। জেলের আনন্দহীন, নির্জন দিনগুলোতে গীতা ও উপনিষদ তাঁকে নতুন পথের সন্ধান দিল। যার ফলে পরবর্তী জীবনে বিপ্লবী অরবিন্দ ক্রমে ক্রমে যোগী অরবিন্দ, ঋষি অরবিন্দে পরিণত হয়েছেন।

অবশ্য জেল থেকে ফিরেই তাঁর এই মানস পরিবর্তন সম্পূর্ণ হয়নি। তখনও রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগ রয়েছে। তবে এখন ধর্ম আর রাজনীতিকে জাতীয় জীবন চেতনার দুটি পৃথক ধারা মনে না করে, এদের মিলিয়ে নিয়ে অরবিন্দ তাঁর কাজের নতুন পথ রচনা করলেন।

ফিরে এসে 'কর্মযোগিন' আর 'ধর্ম' নামে দুটো পত্রিকা বের করলেন। কর্মযোগিন ইংরিজিতে, ধর্ম বাংলায়। রাজনীতি নিয়ে নানা লেখা বেরুত কর্মযোগিনে। সঙ্গে সঙ্গে থাকত অরবিন্দের আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী। অরবিন্দের সহকর্মী হলেন নিবেদিতা। কর্মযোগিনে নিবেদিতা নিয়মিত লেখা দিতে লাগলেন।

কর্মযোগিনের দিকে সরকারের প্রখর দৃষ্টি ছিল। পত্রিকাটির উনচল্লিশ সংখ্যা বেরবার পর ধরপাকড় শুরু হল। নিবেদিতা খবর পেলেন সরকার অরবিন্দকে ধরবার চেষ্টা করছে। খবর দিতে গিয়ে নিবেদিতা তাঁকে পরামর্শ দিলেন বৃটিশ-ভারত ছেড়ে চলে যেতে। অরবিন্দ প্রথমে রাজি হননি। তিনি তাঁর কাজ, মতামত

নিয়ে কর্মযোগীন পত্রিকায় একটা খোলা চিঠি লিখলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার তাঁকে জেলের বাহিরে রেখে শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাই ইচ্ছা না থাকলেও অরবিন্দ কাউকে না জানিয়ে চন্দননগর চলে গেলেন।

'কর্মযোগিনে'র ভার নিলেন নিবেদিতা। কিন্তু চালাতে পারলেন না। সহকর্মীরা আত্মগোপন করেছেন। অর্থের অভাব। নিবেদিতা নিরুপায়। মনে হোল, তাঁর সব কাজের শক্তি উধাও হয়ে গেছে। কেবল পড়ে আছে গুরুর বাণী, কী করেন নিবেদিতা? অসহ্য অশান্তি। কাজ করার ক্ষমতাই বা তাঁর কোথায়? এমন সময় ছুটে এলেন জগদীশচন্দ্র। তিনি প্রস্তাব করলেন, চলো হিমালয়ে বেড়াতে। নিবেদিতা রাজী হয়ে গেলেন। জগদীশচন্দ্র, অবলা বসু আর তাঁর ভাইপো অরবিন্দমোহন বসু নিবেদিতাকে নিয়ে চললেন হিমালয়ের মহাতীর্থে। কেদারনাথ আর বদ্রীনারায়ণে।

তীর্থযাত্রায় এসে নিবেদিতার রূপ গেল বদলে। তীর্থের পরিবেশের সংগে নিবেদিতা নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছেন। এবারেও তাঁর কোন ব্যতিক্রম হল না। গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁরা বেরোলেন হিমালয়ের উদ্দেশ্যে। হরিদ্বারে অনেকগুলি আনন্দময় দিন কাটালেন। তারপর গঙ্গা পার হয়ে কঠিনতর পথে যাত্রা সুরু হল। নিবেদিতারা যাবেন কেদারনাথের পথে। ঠিক হল মেয়েরা যাবেন পাল্কিতে। আচার্য বসু ও অরবিন্দ বসু যাবেন ঘোড়ার পিঠে।

কেদারনাথ শিবতীর্থ। নিবেদিতারা চলেছেন। যাচ্ছেন আরো অসংখ্য যাত্রী। কেউ সবল, কেউ দুর্বল। কেউ বা সক্ষম তরুণ, কেউবা লাঠি সম্বলমাত্র খঞ্জ বৃদ্ধ। দেহের শক্তিতে যাত্রীদের মধ্যে তারতম্য আছে। কিন্তু মনের গোপনে সকলেই এক আশা

পালন করছেন। সকলেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছবেন দুর্গম কেদার তীর্থে।

নিবেদিতা কখন কখন যাত্রীদের সংগে মিশে পায়ে হেঁটে যান। দেখেন নির্বাক, নিরভিমান যাত্রীরা চলেছেন মালা জপ করতে করতে। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে শিব-পদে প্রণতি জানান—জয় কেদারনাথকী জয়।

যাত্রীরা যত উচুতে ওঠেন পথ ততই দুর্গম হয়ে উঠে। কখন কঠিন চড়াই খাড়া ওপরে উঠে গেছে। কখন দুরন্ত উতরাই ঢালু পথে নেমে এসেছে! কিন্তু যাত্রীরা সেই দুরূহ পথ গ্রাহ্য না করে ছুটে চলেছেন। এখানে বহির্জগতের সমস্ত ভেদাভেদ, অর্থ, সম্মান, বুদ্ধির পার্থক্য মুছে গেছে। নেই স্পর্ধা—দুর্বলের ভীরুতা। সারা তীর্থপথ শিব-সংগীতের একক ধ্বনিতে মন্দ্রিত হয়ে উঠেছে। যাত্রীদেরই সঙ্গে ছুটে চলা মুগ্ধা, বিস্মিতা নিবেদিতা এঁদেরই সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়, ত্রিনয়ন মহেশ্বরের পায়ে আপনার ভক্তি উজাড় করে দেন—নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়।

অবশেষে একদিন তাঁরা লক্ষ্যের শেষ সীমায় এসে পড়লেন। পৌঁছলেন কেদারনাথে।

তখন বেলা দুপুর। দেবতার প্রভাতী পূজা শেষ হয়ে গেছে। যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হবে। দেবতার দর্শন পাওয়া যাবে সন্ধ্যারতির সময়।

যাত্রীরা একটু বিশ্রাম করে নিলেন। সন্ধ্যার আগেই সকলের মধ্যে তীব্র সাড়া পড়ে গেল। সকলেই ছুটলেন দুর্বার ভক্তির আবেগ নিয়ে মন্দিরের পথে। যাত্রার অন্তে শুভময়, চিরকল্যাণকর দেবতার সন্ধান পাওয়া গেছে। কি যেন অপ্রাপনীয় লাভ ঘটবে যাত্রীদের। নিবেদিতা যাত্রীদলের সংগেই পথ করে নিলেন।

সন্ধ্যারতি শেষ হলো। দর্শনপ্রার্থীর দল হুড়মুড়িয়ে মন্দিরে প্রবেশ করছে দেবতাকে স্পর্শ করবার জন্যে। নিবেদিতা সিঁড়ির

শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আত্মনিবেদনের আকুতিতে তিনিও উদ্বেল। তাঁর সকল চিন্তা চেতনা ছেয়ে বিরাজ করছেন মহাত্যাগী মহাঐশ্বর্যময় মৃত্যু ও নবজীবনের প্রতীক মহাদেবাদিদেব শংকর। নিবেদিতার সমস্ত বাহ্য জ্ঞান যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। দেব-সান্নিধ্যের এই ক্ষণ-মুহূর্তটি মনে হচ্ছে অখণ্ড, অনন্তকাল। অবশেষে ফিরতে হলো যাত্রীদের। ফিরলেন নিবেদিতাও। অব্যক্ত আনন্দময় অনুভূতির রাজ্য থেকে ক্রমে ক্রমে দেশ-কাল-পাত্র জ্ঞান তিনি ফিরে পেলেন।

কেদার দর্শনের পর বদরী তীর্থের পালা। কেদারনাথের অধীশ্বর যেমন মহাদেব, বদরীনাথে তেমনি ভগবান বিষ্ণু। কেদারনাথের জুড়ি এই বদরীনাথ তীর্থ। এখানে চিরমোহন, করুণাঘন দেবদর্শনের জন্য যাত্রীরা ছুটে আসেন। কণ্ঠে তাঁদের বদরীবিশালের জয়ধ্বনি। জয় বদরীবিশাল কি জয়।

বদরীনারায়ণের পথে নিবেদিতার কেদারের অভিজ্ঞতারই ছাপ আরো গভীর হলো। অন্য সকলের সঙ্গে অন্ধ, বৃদ্ধা খঞ্জ যাত্রীরাও চলেছে এই কষ্টসাধ্য তীর্থ দর্শনে। কি গভীর অনুরাগ! নিবেদিতা অবাক হয়ে দেখেন কি গভীর তাঁদের দেব বিশ্বাস, কি অটুট তাঁদের আত্মনির্ভরতা। অসহায় মনে করে নিবেদিতা যদি কাহাকেও সাহায্য করতে গেছেন, তিনি মিষ্টি হেসে বলেছেন, যে দেবতা এতদূর রাস্তা দেখিয়ে এনেছেন, তিনিই বাকিটা পথ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

বদরীনারায়ণ তীর্থ পরিক্রমা নিবেদিতাদের একটু তাড়াতাড়ি সারতে হলো। কারণ অবলা বসু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এখানে। শ্রীমতী বসুর স্বাচ্ছন্দের জন্যে সাধারণের ব্যবহৃত পথ ছেড়ে, অন্য পথ দিয়ে সকলে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। কারণ এই পথেই ছিল ডাকবাংলো পাওয়ার সুবিধা। অল্পদিন থাকলেও চির তুষারময়, চন্দ্রালোকধৌত রূপালী বদরীর স্মৃতি নিবেদিতার মনে অক্ষয় হয়ে গাঁথা রইল।

ওঁরা ফিরে এলেন জুনমাসের শেষাশেষি। এই বছরেই বেরুল নিবেদিতার সেই বিখ্যাত বই, 'গুরুকে যেমন দেখেছি' (The Master as I saw him)। অপূর্ব এই লেখা। বিবেকানন্দের প্রতিটি চিন্তা, কথা, পদক্ষেপ নিবেদিতার ভাষায় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। স্বামীজিকে এমন গভীর ভাবে দেখেছেন, হৃদয়ে অনুভব করেছেন যার তুলনা হয় না।

স্বামীজির জীবন ও কার্যধারা যেমন দেখেছেন, অনুভব করেছেন নিবেদিতা, তাই দিয়ে রচনা করেছেন এই শ্রদ্ধার দান; গুরুকে যেমন দেখেছি গ্রন্থ। নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে এতে—হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ভারতের সাধারণ লোক ও স্ত্রীজাতির শিক্ষা, রামকৃষ্ণ মঠ, উত্তরভারত ভ্রমণ, অমরনাথ ও ক্ষীর ভবানী দর্শন ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। এরই মধ্যে কয়েকটা বিষয় একটু বিস্তৃত আলোচনা করে আমরা স্বামীজির মতামত ও নিবেদিতার ভাবপ্রবণ মনের স্বরূপ বুঝে নিতে পারি।

বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামীজির গভীর শ্রদ্ধা ছিল। প্রায়ই তিনি বুদ্ধদেবের জীবন ও ধর্ম নিয়ে অন্তরঙ্গদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা বলেছেন স্বামীজি যখন ইতিহাস নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন, তখন তাঁর কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে হারানো অতীত আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠত। একদিন বুদ্ধদেবের সংসার ত্যাগ নিয়ে কথা উঠল। স্বামীজি বলতে লাগলেন গৃহত্যাগের সেই স্মরণীয় রাত্রিতে সিদ্ধার্থের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে জগতের কল্যাণে বের হয়ে পড়তে। তবু তিনি গৃহত্যাগ করতে পারছেন না পত্নীর জন্যে। অবশেষে অন্তরের কল্যাণবাসনাই জয়ী হলো। ঘুমন্ত পত্নীর কাছ থেকে নীরবে বিদায় নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন সিদ্ধার্থ। স্বামীজি বললেন শ্রেষ্ঠ পুরুষদের মন কত বড়! আবার কি রকম নবনীর মত কোমল হয়।

সাত বছর পরে কপিলাবস্তুতে এসেছেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধ-পত্নী

যশোধারার এখানেই বাস। হরিদ্রাভ পরিধেয় বস্ত্র, ফলমূল আহার, ভূমিশয্যা—যশোধারাও স্বামীর আদর্শে সন্ন্যাসিনী। বুদ্ধ এলেন যশোধারার গৃহে। ধর্মকথা আলোচনার পর বুদ্ধদেব যখন গৃহত্যাগ করলেন যশোধারার পুত্র এসে পিতৃপরিচয় দাবী করল। বুদ্ধদেব আনন্দকে বললেন শিশুটিকে একটা গেরুয়া বস্ত্র দিতে। এরপর যশোধারাও বৌদ্ধধর্মের অনুরাগিনী হতে চাইলে বুদ্ধদেব রাজী হলেন; কারণ ধর্মের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ জাতিভেদ থাকতে পারে না।

শুধু বুদ্ধদেবের জীবনকথা নয়। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্ব কথাও আলোচিত হতো। স্বামীজি বলতেন বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র সংঘজীবনের মধ্যেই সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম সার্থক হয়ে উঠতে পারে জীবনের সর্ব অবস্থায়। বৌদ্ধরা এই জগতকে ভ্রম বলে ত্যাগ করতে চায়। কিন্তু হিন্দুরা এই জাগতিক জীবনের অসার বা মিথ্যাকে ত্যাগ করে সত্যকে খুঁজে নেয়। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামিজী আরো বলতেন, হিন্দুরা মানুষের মধ্যে লুকানো দেবত্বে বিশ্বাস করে। এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ হয় মানুষের কর্মের দ্বারা। যে কোন কর্মের মধ্য দিয়াই এই দেবত্বের বহিপ্রকাশ ঘটে। হিন্দুরা জানে ভগবানের কাছে পৌছবার অনেক পথ আছে। যার যা কর্তব্য কর্ম, তা-ই পালন করলেই, নিজস্ব পথে ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ হয়।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে স্বামীজির গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি বলতেন স্ত্রী, পুরুষকে আগে শিক্ষালাভের সুযোগ দাও। তারপর নিজেদের ভালো তারা নিজেরাই খুঁজে নেবে। কি কি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে। কেমন করে শেখানো হবে এ সম্বন্ধে স্বামীজির নির্দিষ্ট মতামত ছিল। এই শিক্ষালাভ কোন বিলাসিতা বা বিজাতীয় ভাবধারা গ্রহণ করা নয়। বিশেষতঃ মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাচীন

ভারতীয় নারীর আদর্শ নতুন করে জেগে উঠুক তা-ই স্বামীজি চাইতেন।

স্বামীজির মতানুসারে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে--তা সে বিধবাশ্রম বা স্কুল কলেজ যাই হোক না কেন, সেখানে শ্যামলভূমি, মেয়েদের শরীর চর্চার সুযোগ, বাগান করা, পশুপালন সেখানকার শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর ধর্ম হবে এই শিক্ষালাভের শেষ উদ্দেশ্য। এই শিক্ষিত মেয়েরাই নারীজাতির নানা সমস্যা নিয়ে কাজ করবে। কাজ ছাড়া তাদের কোন গৃহচিন্তা, ধর্মছাড়া কোন বন্ধন, গুরু, দেশের মানুষ ও মাতৃভূমি ছাড়া অন্য কোন ভালোবাসার আকর্ষণ তাদের থাকবে না।

গ্রামের সাধারণ লোকেদের শিক্ষা সম্বন্ধে স্বামীজি বলতেন উৎসাহী তরুণ ছাত্ররা গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হবে। তাদের সঙ্গে থাকবে ক্যামেরা, ম্যাজিকলণ্ঠন ও পরীক্ষা করে দেখিয়ে দেবার আরো নানা আনুসঙ্গিক উপাদান। গ্রামের লোকের প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে যে জ্ঞানের জগৎ, চিন্তার জগৎ রয়েছে, তাকেই সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত, আকর্ষণযোগ্য করে তুলতে হবে এই শিক্ষা প্রচারের দ্বারা। দেশের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন কেন স্বামীজি? কি দেবে এই শিক্ষা? স্বামীজি বলতেন শক্তি, শক্তি, শক্তি! একমাত্র শিক্ষা ছাড়া প্রাচীন ভারতের গৌরবের সঙ্গে বর্তমানের যোগ রাখা যাবে না। শিক্ষা ব্যতীত ভারতবাসী জানতে পারবে কি মহান ধর্ম, সভ্যতা, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী তারা।

গুরুদেবের অপরূপ মূর্তি এঁকেছেন নিবেদিতা এই বইটিতে। স্বামীজির কাজের ধারার সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন বুদ্ধদেবের কাজের ধারার সঙ্গে। বুদ্ধদেব যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তার ভাব, আদর্শ একদিন ভারতভূমি ছেড়ে এসিয়ার পূর্বদিকে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। নেপাল, চীন, তিব্বত,

সিংহল, শ্যাম, সুমাত্রা প্রভৃতি নানা দেশে বৌদ্ধধর্ম নতুন শিল্প, সাহিত্য ও গৌরবের সৃষ্টি করেছিল। আবার আমাদের দেশ ভারতে এই ধর্ম, হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে একটা নতুন বোধ, নতুন আদর্শের জোয়ার এনেছিল।

বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্মের এই দুই রূপের মতো স্বামীজির কাজেরও, স্বামীজির স্বরূপেরও দুটি পরিচয় আছে। একদিকে তিনি বিশ্বমুখী; অন্যদিকে তিনি স্বদেশমুখী। বিশ্বের দরবারে তিনি ভারতের বেদ, উপনিষদের—সনাতন আদর্শের ব্যাখ্যাতা ভাষ্যকার। তিনি প্রথম পশ্চিমের দেশগুলিকে শুনিয়েছেন প্রাচীন ভারতের গৌরবের কথা। আবার তাঁর মধ্যেই ছিল জাতিগঠনের অমিত উদ্যম। শক্তি এবং কাজে দেশকে জাগিয়ে তোলার স্বপ্ন।

তীর্থযাত্রা থেকে ফিরে নিবেদিতা শুনলেন মিসেস স্যারা বুল খুব অসুস্থ। ধনী, দানশীল এই মহিলার সঙ্গে নিবেদিতার আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের সেবায় তিনি নিজের অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন। নিবেদিতাকে, ভগিনী কৃস্টীনকে, এবং জগদীশচন্দ্রকে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাতে অর্থ সাহায্য করেছেন মিসেস বুল। অসুস্থ স্যারা চাইছেন নিবেদিতা আমেরিকায় চলে আসুন। কিন্তু মাত্র বছর খানেক পশ্চিম থেকে ঘুরে এসেছেন নিবেদিতা। সুতরাং এখুনি তাঁর ভারত ছাড়তে ইচ্ছে হল না। তিনি মিসেস বুলকে উৎসাহ দিয়ে চিঠি দিলেন।

নিবেদিতা টেলিগ্রাম পেলেন মিসেস বুল বোষ্টনে মুমূর্ষু অবস্থায় রয়েছেন। নিবেদিতা প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। মৃত্যুশয্যায় তাঁর পাশে থাকবেন এমন একটা কথাও তিনি মিসেস বুলকে দিয়ে রেখেছিলেন। বুল তাঁর মেয়ে ওলিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন। ওলিয়াকে তিনি ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর সময়ে

ওলিয়া ছুটে এসেছেন। আচমকা নিবেদিতাকে দেখে তার সন্দেহ হল। অত দূর দেশ থেকে নিবেদিতা ছুটে এসেছে কেন? কীসের আকর্ষণে? মায়ের অর্থ। মিসেস বুলের প্রচুর টাকা কড়ি। ওলিয়া নিবেদিতাকে অপমান করে বসলো।

নিবেদিতা নিজের মনকে প্রার্থনায় প্রার্থনায় উদার করে তুললেন। গীর্জায় গিয়ে প্রার্থনা করলেন মিসেস বুলের জন্যে। নিজেও যাতে বিষয়ের মোহে পড়ে না যান এইজন্য অবিরাম তিনি মনে মনে প্রার্থনা করে যেতেন।

১৮ই জানুয়ারী ১৯১১ স্যারা বুল মারা গেলেন।

এর পর বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ওলিয়ার সংগে যে ভুল বোঝাবুঝি সুরু হল তাতে নিবেদিতা গভীর ব্যথায় নির্বাক হয়ে গেলেন। কিন্তু ওলিয়ার প্রতি তাঁর শুভেচ্ছার শেষ ছিল না।

গভীর ব্যথায় বিষণ্ণ মনে এপ্রিল মাসে নিবেদিতা ভারতে ফিরে এলেন। আঘাতে আঘাতে তিনি দেহে মনে অসীম ক্লান্তি অনুভব করেন। মিসেস বুলের মৃত্যুর আঘাত তখনও মুছে যায়নি। এমন সময়ে খবর এল ওলিয়া আত্মহত্যা করেছে, মিসেস বুলের উইল আইনের বাধা পেরিয়ে সুসংবাদ বহন করেছে মিসেস বুল ভারতের কাজে টাকা দিয়েছেন।

এই বছরে পর পর অনেকগুলো শোকের আঘাত নিবেদিতার জন্যে যেন অপেক্ষা করেছিল। গত ফেব্রুয়ারীতে তিনি যখন বিদেশে তখন স্বামী সদানন্দ দেহরক্ষা করেছেন। দেশে ফেরার পর জুলাই মাসে গেলেন স্বামিজীর মা—ভুবনেশ্বরী দেবী। আগেই গেলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতা জানেন দেহ আসে যায়। কিন্তু আত্মা অমর। তাই মৃত্যুতে শোক করবার কিছু নেই। কিন্তু তবু মন মানে না। স্বামিজীর মা,—গুরুভাই। অন্তরের

কত নিবিড় সম্বন্ধ তাঁদের সঙ্গে। সব বন্ধন একে একে সরে যাচ্ছে।

এই সময় বাইরের দিক থেকে নিবেদিতার শান্ত, বিষণ্ণ মূর্তি সকলের চোখে ভেসে উঠতে লাগল। এতগুলো শোক। তার ওপর বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ রয়েছে। ভগিনী ক্রিস্টীন কাছে নেই। তিনি রয়েছেন মায়াবতীতে কিন্তু এখন নিবেদিতার নিকট এক নতুন অন্তর্লোকের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছিল। আরাধ্য দেবতাকে তিনি অতি প্রিয়, অতি নিকট করে অনুভব করতে পারছিলেন। বাহিরের কর্মের জাল তিনি নিজেই ইচ্ছে করে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন। পুজো এবং উপলব্ধিতেই মগ্ন থাকতে চান তিনি। আত্মনিবেদনের আনন্দে হৃদয় উপছে উঠছে।

দেখতে দেখতে পূজোর ছুটি এসে গেল। অন্যান্য বারের মতো এবারেও বসু পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতা দার্জিলিঙে গেলেন। দার্জিলিঙে কয়েকদিন সকলের আনন্দেই কাটল। এর পর ঠিক হলো 'সন্দক্‌ফু'র মন্দির দেখতে যাওয়া হবে। সমুদ্র সমতল থেকে বার হাজার ফুট উঁচুতে তুষারময় গিরিশিখরে আছে এই মন্দির। তুষার ঘেরা পাহাড় চিরদিনই নিবেদিতাকে আকর্ষণ করেছে। এবারেও তিনি রাজী হলেন। বন্ধুর পার্বত্য পথ। ঘোড়ায় করে যেতে হবে। যাত্রার জন্যে উপযুক্ত ঘোড়া, খাবার দাবার সমস্ত প্রস্তুত। কিন্তু নিবেদিতা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যাত্রা পিছিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু নিবেদিতার প্রথমে জ্বর পরে রক্ত আমাশায় দেখা দিল। ডাঃ নীলরতন সরকার তখন দার্জিলিঙে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি এলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন মারাত্মক ব্যাধি আক্রমণ করেছে নিবেদিতাকে। পাহাড়ে আমাশয় দুরারোগ্য ব্যাধি। বন্ধু, শুভার্থীরা ছটফটিয়ে ওঠেন। নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক তাঁকে।

কিন্তু তা আর হোল না। সেখানেই যথাসম্ভব চিকিৎসা হতে থাকলো।

নিদারুণ দৈহিক কষ্টের মধ্যেও নিবেদিতা তাঁর কর্তব্য কর্ম ভোলেননি। তাঁর বিদ্যালয়টির অর্থাদি সম্বন্ধে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা দরকার। পরলোকগত মিসেস বুলের থেকে তিনি যে অর্থ পেয়েছিলেন এবং তাঁর নিজের টাকা, যাবতীয় পুস্তকের আয় নিয়ে যে অর্থ সংগৃহীত হল, তা দিয়ে গঠিত হল বিদ্যালয়ের স্থায়ী অর্থভাণ্ডার। এর আয় বিদ্যালয়ের কার্যেই ব্যয়িত হবে।

এবার নিবেদিতা অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হলেন। শেষ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকেন। দেহ, ব্যাধি তাঁকে কাতর করতে পারে না। মুখে সবসময় মধুর প্রশান্তি। চোখ বুজে নির্বাক হয়ে দিন কাটান অমৃতপথযাত্রী নিবেদিতা। তিনি যেন অনেক দূরে, নিজের সত্তার গভীরে ডুবে যাচ্ছেন। কাছের মানুষেরা, অপেক্ষারত বন্ধুরা সাড়া পাচ্ছেন না। নিবেদিতার বিছানার পাশে ঠাই নিয়েছেন অবলা বসু। কতদিনের বন্ধুত্ব তাঁদের। অবিরাম সেবায় নিবেদিতার মহাপ্রয়াণ লক্ষ্য করতে থাকেন তিনি।

একদিন সকলে এসে ঘিরে দাঁড়াল তাঁর শয্যা। ১৩ই অক্টোবর ১৯১১ সাল। নিবেদিতার বয়স চুয়াল্লিশ। নিবেদিতা অস্ফুট কণ্ঠে কি যেন বলতে চেষ্টা করেছেন। কান পেতে একজন শুনতে চেষ্টা করলেন।

……তরী-ডুবছে……তরী ডুবছে……কিন্তু আবার সূর্য উঠবে………।

নিবেদিতার জীবনতরী ডুবলো। কিন্তু মহাসমুদ্রে ছড়িয়ে রইলো তার অপরিমেয় স্মৃতি-সম্পদ। মরণের মোহানায় এসে নতুন সূর্য দেখার আকাঙ্ক্ষায় তিনি উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন। সেই সূর্যের আলো তিনি কণায় কণায় আমাদের জীবনের কিছু কিছু অন্ধকার কোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে গেছেন। এখানে

ওখানে সেই আলোকের সঞ্চয় নিয়ে আমাদের জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

গুরুর দেওয়া মন্ত্র নিয়ে অসত্য থেকে সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে আলোকের পথে নিবেদিতা যাত্রা করেছিলেন, সেই যাত্রাপথ প্রশস্ত করে ভারতের জনজীবনকেও নিবেদিতা সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। নিবেদিতা আজ মৃত্যু পেরিয়ে অমৃতের পথে যাত্রা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নিবেদিতা লোকমাতা। "লোক সাধারণের প্রতি তাঁহার এই মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মত প্রচণ্ড। বাহির হইতে কেহ নির্মম ভাবে ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না—অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত।"

মাতৃস্নেহের অমৃতের অধিকারী হয়ে মাতৃরূপা নিবেদিতার নিয়ত মংগলময় প্রেরণা আমাদের সূর্য-সাধনা সফল করবে।